দ্বিতীয় অধ্যায়

কোচবিহার রাজ সভায় সাহিত্য চর্চার সূচনা এবং রাজন্যবর্গের ভূমিকা :

[আলোচ্য বিষয়ের সূত্র - সংক্ষেপ : - কামতায় সাহিত্য চর্চার সূচনা —— রাজ পৃষ্ঠপোষকতার বিশিষ্টতা —— রাজন্যবর্গ তথা রাজ পরিবারের সাহিত্য চর্চা —— প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্য সাধনার বিবরণ —— দুটি পর্বের পার্থক্য ।]

" সাহিত্য সংস্কৃতি বিচারে প্রাকৃতিক ভূগোল বা রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে মানব নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সীমারেখা বাহ্য লক্ষণ মাত্র । ভাষাকেই সংস্কৃতি বিচারের প্রধান মানদণ্ড ধরিতে হইবে । বাংলার অতীত ও বর্তমান ভূ-বিন্যাস যেরূপ হউক না কেন , সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে এক ও অখণ্ড সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করা কর্তব্য ।" [১]

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সুচিন্তিত অভিমত মনে রেখে আমরা বর্তমান আলোচনায় অগ্রসর হবো ।

ষোড়শ শতকে কামতায় বা পশ্চিম কামরূপে কোচশক্তির অভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেই এখানে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল । সমগ্র কামরূপ সহ প্রাক্তন উত্তর বঙ্গের উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর কালে কোচশাসনাধীনে এসেছিল — যদিও সে শাসন দীর্ঘদিন বলবৎ থাকেনি । তাহলেও কামতা এবং কামরূপের সাহিত্য সাধনা রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্যের পটভূমি । অর্থাৎ কোচবিহারের সাহিত্য অতীত - নিরপেক্ষ বা সহসা উদ্ভূত চমক মাত্র নয় । ভাষা - সাহিত্য - সংস্কৃতি সব দিক থেকেই তা কামতার এবং কামরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত ।

গৌড়ের পাল ও সেন রাজাদের মতো কামরূপের রাজারাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন । গৌড়ের মতই কামরূপের রাজ সভাগুলোতেও কবিপোষণ ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক । এই সব সভাকবিদের অস্তিত্বের নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় " তাম্রশাসন "গুলি থেকে । এই ' শাসন 'গুলো একদিকে যেমন কবিদের বাক-চাতুর্য ও অলংকার প্রয়োগ - নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় । তেমনি অপরদিকে রাজন্য বর্গের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রীতির নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করে । সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সাহিত্য চর্চার একটা আভাসও পাওয়া যায় । পরিচয় পাওয়া যায় উন্নত সংস্কৃতির । কামতার ধর্মপালের একটি ' তাম্রশাসনে 'র অনুবাদ থেকে জানা যায় যে , দ্বাদশ শতকে কামরূপে খ্যাতিপুনি নামে একটি গ্রাম ছিল । সেখানে — " সদাচার পথের শ্রেষ্ঠ পথিক প্রশস্য-উচ্চারণ দ্বারা পাপক্ষয়কারী ব্রাহ্মণগনের প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাকালে চতুর্বেদ পাঠ ধ্বনি গঙ্গা - যমুনা সঙ্গমে উচ্ছলিত বিপুল জল কল্লোলের ন্যায় (সে) স্থানকে অতিশয় মুখরিত করিত । " এবং সেখানে " যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিন - শাখার সুরু- সৌন্দর্য শোভিত অবিরত প্রবর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ অবস্থিতি করিতেন ।"[২]

কামরূপের ব্রাহ্মণ- অধ্যুষিত জনপদগুলোতে সংস্কৃত শাস্ত্র , পুরাণ , মহাকাব্য প্রভৃতির চর্চা যে রীতিমত হতো তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই । উত্তর কালে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে যখন আঞ্চলিক ভাষায়/সাহিত্য রচনার প্রয়োজন অনুভূত হলো , তখন সে দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগী কবিদের উপর ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ - পঞ্চদশ শতকের কামতার কবিদের মধ্যে হেম সরস্বতী , রুদ্রকন্দলী , হরিবর বিপ্র , কবিরত্ন সরস্বতী এবং মাধব কন্দলী সবিশেষ খ্যাত । কামতার অধিপতি দুর্লভ নারায়ণ এবং ইন্দ্র নারায়ণের পৃষ্ঠপোষণায় হেম সরস্বতী , কবিরত্ন সরস্বতী , হরিবর বিপ্র পুরাণাদির অনুবাদ অথবা পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে আখ্যান কাব্যাদি রচনা করেন । রুদ্র কন্দলীর পৃষ্ঠপোষকরূপে অভিহিত শ্রীফত তাম্রধ্বজের পরিচয় স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি । তেমনি অস্পষ্ট রয়েগেছে বরাহরাজ মহামানিক্যের পরিচয় , যিনি মাধব কন্দলীর পৃষ্ঠপোষক রূপে খ্যাত ।

এই সব কবিদের রচনাদি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে। নীচে এঁদের বিশিষ্ট রচনাবলীর উল্লেখমাত্র করা হলো।[৩]

(ক) হেম সরস্বতী — প্রহ্লাদ চরিত্র এবং হরগৌরী সম্বাদ।

(খ) কবিরত্ন সরস্বতী — মহাভারত (দ্রোণপর্ব) অবলম্বনে রচিত 'জয়দ্রথবধ' কাব্য।

(গ) হরিবর বিপ্র — মহাভারত অবলম্বনে 'বব্রু বাহনর যুদ্ধ' এবং রামায়ণ অবলম্বনে রচিত 'লব - কুশর' যুদ্ধ।

(ঘ) রুদ্র কন্দলী — মহাভারত (দ্রোণপর্ব) অবলম্বনে 'সাত্যকি প্রবেশ' আখ্যান কাব্য।

(ঙ) মাধব কন্দলী — রামায়ণ (ভাবানুবাদ)

উল্লিখিত কবিদের মধ্যে মাধবকন্দলী পূর্বোত্তর ভারতে রামায়ণের আদি অনুবাদক রূপে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কন্দলী বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। যদিও তিনি বলেছেন — "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ — পদবন্ধে নিবন্ধিলো — লম্ভা পরিহরি সারোদ্ধৃতে।"[৪] — কিন্তু তাঁর রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড (অযোধ্যা থেকে লঙ্কা কাণ্ড) মাত্র পাওয়া গিয়েছিল। পরে শ্রীশঙ্করদেব ও মাধবদেব যথাক্রমে 'উত্তর কাণ্ড' এবং "আদিকাণ্ড" অনুবাদ করে মাধবকন্দলীর 'রামায়ণ' কে পূর্ণতা দান করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পশ্চিম কামরূপে (বা কামতায়) আবির্ভূত হন শঙ্করদেব। কামতার তথা কামরূপের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

দুর্লভ নারায়ণ এবং ইন্দ্র নারায়ণের পর থেকে কোচ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কামতায় সভা-সাহিত্য রচনার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, পাঠান আক্রমণ ইত্যাদি কারণে সাহিত্য সাধনা ব্যাহত হয়েছিল। যাই হোক, প্রাক্ কোচ শাসন পর্বে কামতার সাহিত্য প্রধানত রাজসভা কেন্দ্রিক।

দ্বিতীয়ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনুরূপ এখানকার সাহিত্যও উদ্ভব নয় অনুবাদপ্রেরী । কৃত্তিবাসের মতো মাধব কন্দলীও রামায়ণের ভাবানুবাদ করেন । রামায়ণ - মহাভারতের পর্ব বা পর্বাধ্যায় অবলম্বনে রচিত হয় বিভিন্ন আখ্যান কাব্য । পুরাণাদি অবলম্বনে আখ্যানকাব্য রচনারও আভাস পাওয়া যায় । তৃতীয়ত , সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও দেশীয় ভাষায় কাব্যরচনার প্রচুর কবি এবং পৃষ্ঠপোষক উভয়েরই ছিল । সে ভাষা উপভাষা নয় , সাহিত্যের ভাষা । উদাহরণস্বরূপ কবিবল্লভ সরস্বতীর 'ভৃগুবংশ' কাব্যে কৈলাস বর্ণনার অংশ বিশেষ নীচে দেয়া হলো —[৫]

অমল কমল সুকোমল দল ফুলি ফুলি জল শোভে ।
পরি মধুকর গুঞ্জে রুচিকর তার মধু পান লোভে ।।
- -
যত মনোহর সুন্দর কুসুম পারিজাত তথা আছে ।
স্থল অতিশয় কুসুম পল্লব দেখি ভাল গাছে গাছে ।।
- -
নানা পক্ষিগণে অতিসুখ মনে গানে স্তুবেদ সার ।
অতি দীর্ঘ রাত্রে শিক্ষক পড়ায় মধুর ধ্বনি সুস্বর ।।

এই সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য সামান্যই ।

ষোড়শ শতকে ক্ষমতায় মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন কোচরাজ্যে পুনরায় সভা-সাহিত্যের সূচনা হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্য - রচনা অব্যাহত থাকে । এইসু দীর্ঘকাল ধরে যে সাহিত্য-চর্চা হয়েছিল , তাতে রাজন্যবর্গের অবদান কতটা তা আলোচনা করা যাক ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে , রাজসভায় কবি পোষণের রীতিটি দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হয়ে এসেছে ।

রাজপ্রশস্তি এবং 'শাসন' সমূহ রচনার জন্য, রাজ-বংশের গৌরব কীর্তিত করানোর অভিপ্রায়ে অথবা সাহিত্য-রস আস্বাদনের বাসনায় রাজন্যবর্গ সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের নিজ নিজ রাজ সভায় সমাদরের সঙ্গে রাখতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর অংশ রচিত হয়েছে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ পোষণায়। মনে হয় কবিদেরও এটা অভিপ্রেত ছিল। রাজসভার সঙ্গে যুক্ত থেকে কাব্যাদি রচনার দ্বারা রাজন্যবর্গ এবং রাজপুরুষদের চিত্ত বিনোদন করতে পারলে যশ, অর্থ এবং প্রতিষ্ঠালাভ সহজ হতো। সভাকাব্য এবং সভা কবিদের সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় —[৬]

"রাজসভার অনেক কাব্যই রাজমনোরঞ্জন করতে গিয়ে কাল মনোরঞ্জন করতে পারেনি। রাজার ফরমায়েসে যে কাব্যের জন্ম, রাজসভার মনস্তুষ্টি যে কাব্যের ধর্ম, সেই কাব্যে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। কবির কল্পনা, রুচিবোধ যদি রাজরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। কিন্তু সুফল যে হয়নি তা নয়; রাজপৃষ্ঠপোষকতার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কাব্য ও সাহিত্য চর্চার অবকাশ ও অবসর সভা-কবির রচনাকে অনেক ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূও করেছে।"

রাজসভায় প্রধানত ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং রোমান্সধর্মী সাহিত্যের চর্চা হতো। রোমান্স-চর্চায় কবি এবং পৃষ্ঠপোষক উভয়েরই আসক্তি ছিল সমধিক। প্রণয় ও প্রেম, যুদ্ধ ও বীরত্ব, শৃঙ্গার রসের আখ্যান কাব্যগুলো রাজন্যবর্গ এবং সভাসদদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। বিদ্যাপতি থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অনেক কবিই রাজসভায় কাব্যসুধার সঙ্গে কাব্য সুরাও পরিবেশন করেছেন। ষোড়শ শতকে বাংলার সুলতানী আমলে মহাভারত অনুবাদে পৃষ্ঠপোষণার ক্ষেত্রে যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয়ের কাহিনী শোনার আগ্রহ যতটা ছিল, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারের আগ্রহ বোধ হয় ততটা প্রবল ছিল না। 'দিনেকে শুনিতে পারি' নির্দেশ প্রকৃত পক্ষে সংক্ষেপকরণেরই নির্দেশ।

কিন্তু কামতার সাহিত্য সাধনায় কোচরাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা অভিনব রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। পীতাম্বরের "মার্কণ্ডেয় পুরাণে"র (পুথি নং ৮, পৃষ্ঠা ১।ক) ভণিতাটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —

একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ। মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ ।।
শুন সভাসদ জন আমার মনত। আকুত হৈছে উপস্থিত জন যত ।।
সে কথা তোমাত আমি করি উদিরণ। না করিবা হেলা কথা শুন একমন ।।
পুরাণাদি শাস্ত্রে জতি রহস্য আছয়। পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয় ।।
এ কারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার। নিজদেশ ভাসাবন্দে রচিয়ো পয়ার ।।

উদ্ধৃতাংশটি শুধু মাত্র একটি 'ভণিতা' নয়, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজন্যবর্গের সাহিত্য সাধনার এবং পৃষ্ঠপোষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পুরাণাদি শাস্ত্রের রহস্য — যা শুধু মাত্র পণ্ডিতজনের বোধগম্য — সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্যই সভাকবিদের পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। ভাষাও ঠিক করে দেয়া হলো। — "নিজদেশ ভাসাবন্দে রচিয়ো পয়ার"।
এ আদেশ দ্ব্যর্থহীন এবং প্রায় অলঙ্ঘ্য —

"না করিবা হেলা কথা শুন একমন।"

রোমান্সের আকর্ষণে নয়, পুণ্যার্জনের প্রত্যাশা পোষণার জন্যও নয়, জনগণের অশিক্ষিত প্রজার মানস ভূমিতে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ভোগবতী ধারা সিঞ্চনের জন্যই রাজচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য সাধনার সঙ্গে জনকল্যাণ বিধানের মহৎ উদ্দেশ্য যুক্ত করে রাজন্যবর্গ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা কেবল অভিনব নয়, অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।
শুধু মাত্র রসসাহিত্য বা পুরাণাদির অনুবাদকর্মেই পৃষ্ঠপোষণা হয়েছিল তা নয়। xxx মননশীল গ্রন্থাদি রচনারও উৎসাহ দেয়া হয়েছে। মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল —[৭]

শুনিয়ো পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য দ্বিজ ।
করিয়োক রত্নমালা ব্যাকর্ণর বীজ ।।
শুনিয়ো শ্রীধর তুমি মোর বাক্য ধরা ।
জ্যোতিষক ভাষি তুমি সাধ্যখণ্ড করা ।।
বকুল কায়স্থ তুমি ভাষা লীলাবতী ।
অঙ্কত বুজয় যেন কায়স্থে সম্প্রতি ।।

রাজ পৃষ্ঠপোষণা শুধু মাত্র আদেশ দানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি —

" পণ্ডিত সবক পাছে করিলা সম্মান ।
ধনরত্ন বস্ত্র অলংকার দিলা দান ।।" [৮]

পৃষ্ঠপোষণার আর একটি ভণিতির উদাহরণ পাওয়া যায় মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি রাম সরস্বতীর ' বনপর্ব্বের ' একটি ভণিতায় —[৯]

আমাক করিলা আজ্ঞা পরম আদরে ।
ভারতর পদ তুমি করিয়োক নরে ।।
আমার ঘরত আছে জয়াটীকা যত ।
নিয়োক আপোনার গৃহে দিলোঁয়ো সমস্ত ।
এই বুলি রাজা সবে বলদি যোরাই ।
পঠাইলা পুস্তক সবে আমাসার ঠাই ।।

ধন-বস্ত্র - অলঙ্কার দান দাতার আভিজাত্য এবং ঔদার্য্যতার পরিচয় । তত্ত্ব হিসেবে একে চমকপ্রদ বলা যায় না । কিন্তু রাজপুঁথির ' জয়াটীকা ' কবি গৃহে প্রেরণের এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা সন্দেহ ।

উত্তর সুরীরাও এমনি অনুগ্রহ এবং বদান্যতা দেখিয়েছেন । কবি প্রশস্তি তার স্ব প্রমাণ । আদিপর্ব রচয়িতা শ্রীনাথ মহারাজ প্রাণ নারায়ণের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে বলেছেন —[১০] " দরিদ্র জনার তাঞি বাঞ্ছা কল্পতরু " ।

'প্রস্থানিক পর্বে' দ্বিজ বৈদ্যনাথ অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে নৃপতির (মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণের) "অতিশয় নিজ পোষ্য" বলেছেন। পৃষ্ঠপোষকতায় রাজাংশঃ পুরিকাদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্বিজ কবিরাজ গদাপর্বের একটি ভণিতায় লিখেছেন —[১১]

ধন্য ধন্য অনুপ কুমারী দেবী আই।
যৈমন পুত্রক গর্ভবাসে দিছে ঠাঁই।।

অনুপকুমারীদেবী মহারাজ প্রাণনারায়ণের মহিষী এবং মহারাজ মোদনারায়ণের জননী।

রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় দরিদ্র অসচ্ছল কবিদের অনেকেই হয়ত মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন নি। প্রশস্তি অনেক ক্ষেত্রেই স্তুতিনতির পর্যায়ে গিয়েছে। সভাকবিদের এই ত্রুটি এখানেও কলঙ্কবাহী ঘটেছে। তবুও কিছু বলার আছে।

যিনি আসামের নববৈষ্ণব আন্দোলনের জনক, যিনি একাধারে সাধক ও কবি সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ শঙ্করদেব কিছুতেই অনৃতভাষণ বা নিছক তোষামদের দ্বারা রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করবেন না। মহারাজ নরনারায়ণের প্রশস্তি রচনা করে তিনি মহারাজের গুণাবলীর সম্যক পরিচয় দিয়েছেন।

" আপন নৃপবর ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির
বিচারত আপন সুজ্ঞান।
কাব্য কবিত্ব শশধর পণ্ডিত
ধনুর্দ্ধর অর্জুন সমান।।
মানে দুর্যোধন আপন গুণাজন
দানে কর্ণ সমান।"[১২]

এই বংশের অনেক রাজাই শাস্ত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের মতো কবিও মহারাজ প্রাণনারায়ণকে ' কাব্য সঙ্গীতের [illegible] দীপাঙ্কুর ' বলে বন্দনা করেছেন। রাম সরস্বতী শুক্লধ্বজ সম্বন্ধে লিখেছেন —[১৩]

" জয়দেব নামে কাব্য বিরচিলো সার।
শুক্লধ্বজ রাজা টীকা করিলন্ত যার।।"

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ কবি, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে কোচবিহারের সাহিত্য সাধনা নববর্ষার অকৃপণ বর্ষণপুষ্ট স্রোতস্বিনীর মতো বেগবতী হয়ে ওঠে। তাঁর রাজ সভায় বহু সংখ্যক কবির সমাগম ঘটে এবং মহারাজ স্বয়ং সাহিত্য সাধনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের শেষে যখন আধুনিক সাহিত্যের সূচনা হলো তখনও রাজ-পরিবারই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষণার প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদারতা এবং নিরপেক্ষতা। রামায়ণ - মহাভারত - ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদির অনুবাদে তাঁরা সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত আখ্যান কাব্যাদির প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ ছিল না। মননশীল রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা উৎসাহ দেখিয়েছেন।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ প্রবল ধর্মান্ধতার যুগ - ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান, শাক্ত - বৈষ্ণব বিরোধে কলঙ্কিত। কিন্তু কোচ-রাজারা পুরুষানুক্রমে উদার এবং সহিষ্ণু ছিলেন। প্রধানত শৈবশাক্ত মতাবলম্বী এই রাজবংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মমত প্রাধান্যলাভ করলেও পৃষ্ঠপোষণের ক্ষেত্রে অথবা সাহিত্য চর্চায় তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য চেতনার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালেই বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রবর্তক শঙ্করদেবের সাহিত্য-কীর্তির সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। কোচরাজন্য বর্গের বদান্যতায় অসমীয়া সাহিত্যও পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করেছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা ক্লাসিক ও পুরাণ চর্চায় বাংলার

আর কোনো রাজবংশ এত দীর্ঘকাল ধরে এমন আগ্রহ দেখায়নি বা আনুকূল্যদান করে নি ।

কোচরাজন্যবর্গের সাহিত্য সাধনা এবং পৃষ্ঠপোষণা নিছক খেয়াল বা আভিজাত্য প্রকাশক মাত্র নয় । সাহিত্যের রসাস্বাদনে তাঁদের অধিকার ছিল । সাহিত্য সাধনা এবং পৃষ্ঠপোষণাকে তাঁরা ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন । ডঃ শশি-ভূষণ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন —

' This effort of the Ruling House of Cooch Behar for centuries was, therefore, not inspired merely by a literary motive ; it was also something like a cultural mission of which Cooch Behar may well feel proud and for which all Bengal should remain grateful to the Ruling House'

[A Descriptive Catalogue of Bengali Manescript of Cooch Behar. Introduction - p. iv]

কোচশাসনাধীন কামতার সাহিত্য সাধনা দুটি পর্বে বিভক্ত । প্রথম পর্বটির কালসীমা ষোড়শ শতক থেকে প্রায় ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রসারিত । আর দ্বিতীয়টির কাল সীমা ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের চারদশক পর্যন্ত প্রসারিত ।

প্রথম পর্বে সাহিত্য সাধনার ধারা প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে —

(ক) সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ ।

(খ) আঞ্চলিক ভাষায় এবং সংস্কৃতে বিভিন্ন আখ্যান কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনা ।

(গ) রাজ্যের বাইরে রচিত সাহিত্য গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সমূহ সংগ্রহের ও সংরক্ষণের প্রয়াস ।

গ্রন্থগুলি মূলত: এবং মুখ্যত: অনুবাদ সাহিত্য । প্রাচুর্যে এবং উৎকর্ষে এটিই প্রধান । কোচবিহারের সভাকাব্য বলতে রামায়ণ , মহাভারত এবং ভাগবত সহ অন্যান্য স্ব পুরাণাদির আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদকর্মই বুঝায় । রাজন্য বর্গের পৃষ্ঠপোষণার সিংহভাগ পেয়েছেন অনুবাদে ব্রতী কবিরাই ।

দ্বিতীয় খাতে প্রবাহিত হয়েছে মৌলিক রচনাবলী । এতে রয়েছে — মঙ্গলকাব্য , পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত বিবিধ আখ্যান কাব্য , লীলা ও ভজন পদ, বৃত্তিমপদ্যে রচিত কয়েকটি নাট ; ব্রতকথা , পাঁচালী , উপকথা প্রভৃতি । এই ধারার বিশিষ্ট রচনাবলীর উল্লেখ নীচে করা হলো —

<u>ষোড়শ শতাব্দী :</u>

পীতাম্বর রচিত —

(১) 'ঊষা পরিণয়' — ভাগবত ও হরিবংশ অবলম্বনে রচিত আখ্যান কাব্য ।

(২) নলদময়ন্তী উপাখ্যান — মহাভারত অবলম্বনে রচিত আখ্যান কাব্য ।

দুর্গাবর — গোক্ষা বেহুলী মঙ্গল (মনসা মঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথি)

মনকর — গোক্ষার পাঁচালী - - - - ঐ - - - - - -

(কাব্যদুটির একটি অপরটির পরিপূরক ।)

<u>শঙ্করদেব :</u>

১। কীর্তন ঘোষা বা লীলাপদ ,

২। নাম ঘোষা বা ভজনপদ ,

৩। বরগীত বা ('ব্রজবুলি'তে রচিত) পদগীতি ।

৪। ভটিমা বা প্রশস্তি পদ । ভটিমা দু-প্রকারের —

(ক) দেব ভটিমা ও (খ) রাজভটিমা ।

৫। নাট — ব্রজবুলি বা কামরূপী - মৈথিলী ভাষায় রচিত একাঙ্ক নাটকের মতো রচনা। গদ্য - পদ্য, - গীত - ভটিমা সমন্বিত এ নাটগুলোর আঙ্গিকও অভিনব। রামায়ণ, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ অবলম্বনে রচিত এই নাটগুলো অভিনীত হতো। নাটগুলির নাম — কালিদমন, কেলিগোপাল, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ, রাম বিজয়। (বিশদ আলোচনা ৩য় অধ্যায়ে করা হয়েছে)।

৬। নিমি নবসিদ্ধ সংবাদ।

৭। ভক্তি প্রদীপ।

৮। ভক্তি রত্নাকর।

(৬, ৭, ৮ রচনা তিনটি ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে রচিত। এর মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।)

<u>অনন্ত কন্দলী :</u>

শঙ্করদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কবি অনন্ত কন্দলী —

(ক) সীতার পাতাল প্রবেশ নাট এবং

(খ) ভাগবত অবলম্বনে 'কুমর হরণ' নামক রোমান্টিক আখ্যান কাব্য রচনা করেন।

<u>রাম সরস্বতী :</u>

মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে রাম সরস্বতী মহাভারত, যোগিনী সংহিতা এবং অন্যান্য উপপুরাণ অবলম্বনে বহুসংখ্যক আখ্যান কাব্য রচনা করেন। প্রথম অধ্যায়ে এ সবের উল্লেখ করা হয়েছে। রাম সরস্বতীর 'জয়দেব' কাব্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ষোড়শ শতকের অন্যতম কবি শঙ্কর শিষ্য মাধবদেব গুরুর মতই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকাল কোচবিহারেই অতিবাহিত হয়েছিল। অনুবাদকর্ম এবং মৌলিক রচনা - উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তাঁর বিশিষ্ট মৌলিক রচনার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো —

১। ভক্তি রত্নাবলী — এর একটি পুঁথি (অসমীয়া পুঁথি নং ১) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে (কোচবিহার) আছে।

২। শ্রীকৃষ্ণজন্ম রহস্য — ---- ঐ --- (অসমীয়া পুঁথি নং ১৫)

৩। রাজসূয় কাব্য — ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ শর্মার[১৪] মতে এটি পুরুষোত্তমের উৎসাহে এবং শঙ্করদেবের নির্দেশে রচিত হয়।

৪। নাম ঘোষা — জীবনের অন্তিম কালে এই কাব্যটি কোচবিহারের ভেলাডাঙায় রচিত হয়েছিল। ডঃ শর্মার[১৫] মতে এটিই শ্রেষ্ঠ রচনা।

গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাধবদেবও বরগীত, ভটিমা, নাট প্রভৃতি রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে বরগীতে তাঁর কবি প্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

সপ্তদশ শতাব্দী :

সপ্তদশ শতাব্দীর মৌলিক রচনাবলীর অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণমিশ্রের প্রহ্লাদ — ম চরিত এবং রামরায় রচিত গুরুলীলা প্রধান।[১৬]

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজ মোদনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত একটি আখ্যান কাব্যকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত অসমীয়া পুঁথি তালিকাভুক্ত (পুঁথি নং ১ - এ) করেছেন এবং পুঁথিটিকে 'সুবর্ণঘাটিকা পদ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এটি বাংলাভাষায় রচিত একটি আখ্যান কাব্য এবং এর প্রকৃত নাম হবে 'সুবর্ণ ঘোটকী পদ'। দুর্বাসার অভিশাপে উর্বশীর ঘোটকীরূপ ধারণ করে মর্ত্যে

বিচরণের সমসুকার ঘটনা অবলম্বনে যদু মণি নামে জনৈক কবি আখ্যান-কাব্যটি রচনা করেছিলেন ।

উনবিংশ শতাব্দী : -

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের সাহিত্য সাধনা নানা কারণে ব্যাহত হওয়ায় অনুবাদ সাহিত্য বা মৌলিক কাব্য সাহিত্য বিশেষ কিছু রচিত হয়নি বললেই চলে । উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য সাধনা বহুমুখী হয়ে ওঠে ।
এ যুগের মৌলিক রচনাবলীর মধ্যে —

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের দুটি উপকথা এবং গীতাবলী (এ অধ্যায়ের শেষে বিস্তৃত আলোচনা আছে), মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ, মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' উল্লেখযোগ্য ।

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালের অপর দুটি উল্লেখ যোগ্য রচনা হচ্ছে —

(ক) গোসানী মঙ্গল – রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী । এটি বর্তমানে মুদ্রিত ।
(খ) কালিকা পুরাণ - শ্রীযুক্ত সুন্দর । (সাহিত্য সভা পুঁথি নং ১৬)

বিংশ শতাব্দী :-

বিংশ শতকের সূচনা কাল থেকে কোচরাজত্বের অবসান পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় । উনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় সাহিত্য সাধনার ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে । এর পর মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বে আধুনিক সাহিত্যের একটি শীর্ণ ধারার উদ্ভব ঘটে । সে সাহিত্য সাধনায় মুখ্য ভূমিকা ছিল রাজ পরিবারের । প্রথম অধ্যায়ে এই সাহিত্য সম্ভারের উল্লেখ করা হয়েছে । এই অধ্যায়ের শেষে এর আলোচনা করা হবে ।
রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার তৃতীয় ধারাটি সৃষ্টি হয়েছে রাজার বাইরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি

সমূহ সংগ্রহের দ্বারা। বর্তমান প্রকল্পের সঙ্গে এ ধারাটির প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবে পরোক্ষ যোগ আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি আহরণ এবং সংরক্ষণের প্রয়াস, এখানকার রাজন্যবর্গের ও সাহিত্যামোদীদের সমকালীন সাহিত্যের বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দেয়। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি উভয় দিক থেকেই এই যোগসূত্র স্থাপন করাটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে রাজ্যে রচিত সাহিত্যের একটা তুলনামূলক চিত্রও তাঁরা এর মাধ্যমে পেয়েছিলেন। একে সাহিত্য-প্রীতির নিদর্শন বলে গ্রহণ করতেও বাধা নেই।

৬ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'Descriptive catalogue of Beng. Mss" ——— এ উল্লিখিত এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে কয়েকটির গুরুত্ব অসাধারণ। যেমন —

(ক) পদ্ম-পুরাণ (পুঁথি নং ৫০) - সুকবি নারায়ণ দেব।

পুঁথিটি সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য নীচে দেয়া হলো।[৭]

"The Editor Dr. T.C. Das Gupta M.A. Ph.D. had at his disposal incomplete manuscripts and the complete text could not be reconstructed from the manuscripts available. Moreover the published text shows no proper arrangement of the stories of the plot .... Fortunately, the manuscript preserved in the State Library is complete and fairly old, and although calligraphy is not yet a dependable evidence in ascertaining the date of manuscript, we are tempted to believe that the Ms. is about 250 years old. Unlike the text published by the University of Calcutta, the text in this Ms. shows good arrangement of the plot"

(খ) বৃন্দাবন দাসের ' চৈতন্য ভাগবত' পুঁথিটি (পুঁথি নং ৩১ , ৩২ , ৩৩)

আদি মধ্য — অন্ত্যখণ্ডে সম্পূর্ণ এবং দেড়শ বছরের মতো প্রাচীন । এটিতে প্রক্ষেপ ঘটার সম্ভাবনাও কম ।

(গ) বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে হৃদানন্দের ' চৈতন্য চরিত' (পুঁথি নং ৫০) পুঁথিটির উপর । চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি একটি নতুন সংযোজন কি না তা বিচার করা কর্তব্য । পুঁথি থেকে এর রচনাকাল নির্ণয় করা যায় নি ।
বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ দেখে ডঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেছেন , কবি তাঁর (বৃন্দাবন দাসের) পরবর্তী কালের । দু-এক জায়গায় বলভদ্র পণ্ডিতের উল্লেখ আছে ।
পুঁথিতে কোনো নাম দেয়া হয় নি । উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতের ঘটনা পর্যন্ত বিবৃত করে পুঁথি সমাপ্ত করা হয়েছে ।

রাজ্যের বাইরে রচিত এবং সেখান থেকে সংগৃহীত এসব পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে Descriptive Catalogue of Beng. Mss ---- — এ । মধ্যযুগের অনুবাদ ও মৌলিক রচনাবলীর ইতিহাসে নতুন তথ্য সংযোজিত হতে পারে উল্লিখিত পুঁথিগুলিতে বিধৃত তথ্য সমূহের বিশ্লেষণে ।

প্রসঙ্গত : আর একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । কোচশাসনাধীন কামতায় আঞ্চলিক সাহিত্যের ভাষায় রচিত সাহিত্য সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করলেও , সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা কিছু কম ছিল না । রাজন্যবর্গও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে কার্পণ্য করেন নি ।
মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন । মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রচিত " প্রয়োগ রত্নমালা " নামে ব্যাকরণ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা আছে —

শ্রী মল্লদেবস্য নৃপৈকশিরোধার্য্যাজ্ঞা মহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্ ।
যথাৎ প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিস্তন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন ।।[১৮]

নরনারায়ণের রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ 'কৌমুদী' নামে অনেকগুলো স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে সম্ভবত এগুলো রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ "বিশ্বসিংহ চরিতম্" রচনা করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'প্রয়োগ রত্নমালা'র টীকা রচনা করেছিলেন।[১১]

মহারাজ নরনারায়ণের সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল্যবান রচনাবলীর পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলোর নকল কার্য শুরু হয়। সংস্কৃতে লেখা বহুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি এখনও রয়েছে কোচবিহার সাহিত্য-সভায় এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে। উঃ বঃ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৫ টি পুঁথির কোনো Descriptive Catalogue - তৈরী হয়নি। বিষয়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে যে এগুলোর মধ্যে রামায়ণ - মহাভারত - ভাগবতই সংখ্যাধিক। এছাড়া রয়েছে স্তোত্র, তন্ত্র, সংহিতা, ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'দত্তবিবেক', গোপালভট্টের 'দানখণ্ড' এবং কৃষ্ণচন্দ্র শর্মার 'মহানির্বাণতন্ত্র'।

সাহিত্য সভায় রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিগুলির একটি Descriptive Catalogue তৈরী করেছেন ডঃ দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল। পুঁথিগুলোতে আছে ব্যাকরণ, তন্ত্র, স্মৃতি, শ্রাব্যকাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, ন্যায়, মীমাংসা, শব্দকোষ, গীতা ও পুরাণ, বৈদ্যশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত এবং একখানা প্রেমাত্মক রচনা। পুঁথিগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি সুন্দর মন্তব্য করেছেন[২০] ডঃ কাঞ্জিলাল। তাঁর মতে একসময় উত্তর ভারতই ছিল সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রধানকেন্দ্র। কিন্তু দ্বাদশ শতক থেকে মুসলিম অভিযান শুরু হলে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও আচার্যগণ পূর্ব ও পূর্বোত্তর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর বঙ্গ ধন্য হয় প্রখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধ-বৈয়াকরণ মৈত্রেয় রক্ষিতের শুভাগমনে। তাঁর অনুগামী হয়ে আসেন সৃষ্টিধরাচার্য, সনাতন চক্রবর্তী, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ বৈয়াকরণগণ এবং কেদারনাথ তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,

হরিহরানন্দ সার্বভৌম প্রমুখ প্রখ্যাত তন্ত্রবিশারদগণ। এঁদের আগমনে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি নতুন ধারার উদ্ভব-সম্ভাবনা দেখা দেয়। যাই হোক, কোচবিহারে সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথিসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে — (১) মৈত্রেয় রক্ষিতের 'তন্ত্রপ্রদীপ', (২) সৃষ্টিধরাচার্যের 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবৃত্তি', (৩) বিনুহলের 'শাব্দিকমটক্' এবং (৪) পুরুষোত্তম দেবের 'লঘীবৃত্তি'। স্মৃতিবিষয়ক রচনায় কোচবিহারের নিজস্ব অবদান স্বরূপ বিষ্ণুপ্রসাদ মুস্তাফীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদন' রচনাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সূচনাতেই বলেছি যে, তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে বর্তমান গবেষণার বা প্রকল্পের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও পরোক্ষ যোগ কিছু আছে। উদ্ভবকাল থেকেই এই বংশের রাজারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁদেরই প্রশ্রয়ে ও আনুকূল্যে কোচবিহার হয়ে উঠতে পেরেছিল মননশীল ও রস-সাহিত্য চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। তাছাড়া রাজন্যবর্গ এবং রাজ্যের বিদ্বৎমণ্ডলীর সারস্বত চেতনার নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত উদ্যম থেকে।

রাজন্যশাসিত কোচবিহারে সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ এক বিরাট এবং বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন —

"It will not be an exaggeration to say that the reign of Maharaja Harendra - narayan marks a chapter in the history of Bengali Literature of the late eighteenth and early nine-teenth centuries."

পৃষ্ঠপোষক এবং কবি উভয়রূপেই মহারাজ যে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে এ মন্তব্য সঙ্গত বলে মনে করতে কোন সংশয় হয় না।

কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতকে বহিরাক্রমণ, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে পূর্ববর্তী দু'শত বৎসরের সাহিত্য সাধনার ধারাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে মহারাজ

হরেন্দ্র নারায়ণ সেই শুষ্কখাতে ভোগবতী ধারা প্রবাহিত করে সারস্বত সাধনার পথ সুগম, সুন্দর এবং সুপ্রশস্ত করেন। মহারাজ স্বয়ং শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত - নৃত্য - চিত্রকলা প্রভৃতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর। অথচ তাঁর রাজত্বকালের প্রথমার্ধ প্রবল অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এত অশান্তি সত্ত্বে সাহিত্যভারতীর যে সাধনা তিনি নিজে করেছেন এবং যে বিপুল সাধনার পথ উদার দাক্ষিণ্যের দ্বারা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের সভাকাব্যের ঐতিহাসে তা তুলনা রহিত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হরেন্দ্র নারায়ণের রচনাবলী সংখ্যায় অল্প হলেও বৈচিত্র্য - প্রবীন। পুরাণাদির অনুবাদ, উপাখ্যান, উপকথা এবং গীতাবলী তাঁর রচনা সম্ভারে বৈচিত্র্য এনেছে। তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো —

১। রাজপুত্র উপাখ্যান (পুঁথি নং ১১) - উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত।
২। ক্রিয়াযোগসার (পুঁথি নং ২০) - "
৩। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (মধ্য ও উত্তর খণ্ড) - (পুঁথি নং ২ ও ২২) "
৪। স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্মোত্তরখণ্ড) - (পুঁথি নং ২৩) "
৫। রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড) - (পুঁথি নং ৩০) "
৬। মহাভারত - দ্রোণপর্ব - (পুঁথি নং ৭৩) "
৭। মহাভারত - সভাপর্ব (পুঁথি নং ৭৬) "
৮। মহাভারত — গদা পর্ব (পুঁথি নং ৮০) "
৯। উপকথা (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় মুদ্রিত।
১০। গীতাবলী।

'রামায়ণ - সুন্দর কাণ্ড' ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী ঘোষালের সম্পাদনায়

সাহিত্যসভা থেকে প্রকাশিত হয় । উল্লিখিত রচনাবলী পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থাকারে কোচবিহার সাহিত্য সভায় আছে ।

স্পষ্টত হরেন্দ্র নারায়ণের রচনাবলী দুটি পৃথক ধারার অন্তর্গত । প্রথম ধারায় পড়ে মৌলিক রচনাবলী । যেমন — উপকথা , রাজপুত্র উপাখ্যান , গীতাবলী ইত্যাদি । দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে — অনুবাদ সাহিত্য । রামায়ণ , মহাভারত ও পুরাণাদির অনুবাদ ।

' উপকথা ' এবং সম্ভবতঃ ' রাজপুত্র উপাখ্যান 'ও (পুঁথি নং ১১) মহারাজের প্রথম বয়সের রচনা । ' উপকথা 'র ভণিতায় রচনা কালের উল্লেখ রয়েছে —

বেদগ্রহভুজ সকাব্দানিবৃত্ত মিথুনরাশীত রবি ।
ঊনবিংশতিক দিনে সাম্প্রতিক সমাপ্ত করিল কবি ।।

এ থেকে জানা যায় যে কবি ২১৪ রাজশাকে অর্থাৎ ১২২০ বঙ্গাব্দের ১১শে আষাঢ় এ কাব্য সমাপ্ত করেন । হরেন্দ্র নারায়ণ ১১৮৬ সনে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১১৯০ সনে শৈশবাবস্থায় সিংহাসনে বসেন । ' রাজোপাখ্যান ' অনুসারে তিনি ১২০৩ সনে স্বহস্তে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করেন ।[২২]

অতএব উপকথা রচনার সময় তিনি বিংশতি বর্ষীয় যুবক মাত্র ।

' রাজপুত্র উপাখ্যান '- টি কবি শুনেছিলেন তাঁর মুন্সী জয়নাথ ঘোষের মুখে — (পুঁথি নং ১১ , পৃ : ৪।৮)

জয়নাথ নাম , গুণ অনুপাম , মুনসি কার্য্যে লেখক ।
তার প্রমুখাত , যুনিতো পশ্চাত , আরম্ভিল এ কথক ।।

কাহিনীটি ছিল এক ফার্সী কিতাবে । কবি ঘটনাস্থল এবং পাত্র পাত্রীর নাম বদলে দিয়েছেন । কিন্তু মূল কাহিনীর কতটা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তার কোনো ইঙ্গিত দেননি । দ্বিতীয় আখ্যানটি কবি জনৈকা অন্তঃপুরিকার কাছে শুনে আখ্যানকাব্যের রূপ দিয়েছেন । কিন্তু পরিবর্ধনের চেষ্টা করতে গিয়ে কাহিনী শিথিল হয়ে পড়ায় গল্পটি নিটোল - জমাট রূপ গ্রহণ করতে পারেনি ।

উপকথাটির কাহিনীগত চমৎকারীত্ব ততটা না থাকলেও ধর্ম সম্পর্কহীন মানবরসাশ্রিত আখ্যান কাব্য রূপে বিশিষ্টতার দাবী রাখে । বিলাসকলার বর্ননায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব কোনো কোনো অংশে দেখা গেলেও তা সুরুচি এবং শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে নিছক ' কামকেলি 'র বর্ণনা হয়ে ওঠেনি ।

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের বিশিষ্ট রচনা ' গীতাবলী ' । এটি কোচবিহার সাহিত্যসভার উদ্যোক্তা শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । ১৩২৭ সন থেকে ১৩৩৮ সনের মধ্যে শ্রী ঘোষালের সম্পাদনায় হরেন্দ্র নারায়ণের রচনাবলীর অধিকাংশই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । ' গীতাবলীর ' সম্পাদক শ্রী ঘোষাল কোচবিহার স্টেট্ কাউন্সিলের মহাফেজখানায় রক্ষিত একটি খাতায় এ সঙ্গীতগুলো দেখতে পান । সূচীপত্রে ১৭৮ টি সঙ্গীতের উল্লেখ থাকলেও ১০ নং থেকে ১৫ নং পর্যন্ত সঙ্গীতগুলো খাতায় পাওয়া যায়নি । তবে সূচীপত্রে সেগুলির প্রত্যেকটির প্রথম পংক্তিটি লেখা ছিল । শ্রী ঘোষাল আরও লক্ষ্য করেন যে —

" বাকী ১৭১ টি গানও সব মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের বিরচিত নহে । তিনটি সঙ্গীত (৬৬ নং , ১৬৪ নং এবং ১৬১ নং) দুর্গাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায় । - - - - - - - পদাভক্তি তরঙ্গিনী কার দুর্গাপ্রসাদ ও গীতাবলীর রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ এক কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই ।" [২৩]

কয়েকটি সঙ্গীতের (৬৪ , ৭০ , ১০৪ , ১৩৩ , ১৬৬ নং) ভণিতায় রচয়িতার নাম নেই । অন্যান্য সঙ্গীতে — ' হরেন্দ্র ' , ' ভূপ ' , ' নররাজ ' প্রভৃতি নামগুলো আছে । তবে ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করলে সেগুলো মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ বিরচিত বলেই মনে হয় । শ্রী ঘোষালের অভিমত তাই । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শক্তি পদাবলী ' সংগ্রহ গ্রন্থে মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের " ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী "

গীতটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তি মহারাজকে বাংলার অন্যতম শাক্ত - পদকর্তা রূপে স্বীকৃতি দান স্বরূপ। (শাক্ত পদাবলী, ৭ম সংস্করণ শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ খ্রী:)
প্রাপ্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে আগমনী (১০ টি), দুর্গাস্তব (৩ টি), সরস্বতী বন্দনা (২ টি), নদীবন্দনা (৩ টি), শিব বন্দনা (১ টি), হরগৌরী সংবাদ (১ টি) আছে। অবশিষ্টগুলি শ্যামাসঙ্গীত। প্রত্যেকটি সঙ্গীতের প্রথমে 'ধুয়া' এবং 'চিতান' আছে। তাছাড়া প্রতিটি সঙ্গীতের শীর্ষে (বসন্ত, ভৈরব, মল্লার, জয় জয়ন্তী, ললিত, সারঙ্গ, বিভাস, ঝিঁঝিট প্রভৃতি) নানা রাগ - রাগিনীর উল্লেখ রচয়িতার সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। নানা প্রকার তালের উল্লেখও আছে। কিছু কিছু 'গীত' টপ্পা সুরে গাওয়া হতো। আবার কোন কোনটির শীর্ষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রামপ্রসাদী সুর। সুপ্রসিদ্ধ শাক্তকবি রাম প্রসাদের পদ সমূহের সঙ্গে মহারাজের যে নিবিড় পরিচয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মহারাজের 'গীতাবলী' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র্যে ও মৌলিক চেতনায় সমুজ্জ্বল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদকর্তাদের অনুসরণে রচিত হলেও কবির স্বকীয়তা ক্ষুন্ন হয়নি।

হরেন্দ্র নারায়ণ উমার 'বাল্যলীলা' কিংবা 'বিজয়া' বিষয়ক পদ রচনা করেননি। কিন্তু 'আগমনী' বিষয়ক পদরচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। প্রবাসীতনয়ার জন্য জননীর উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা সার্থক ভাব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। উমা বিরহে কাতরা জননী বলছেন —

"ব্যাকুলিত হিয়া নাথে সম্বোধিয়া
কহিছে কাঁদিয়া নন্দরানী।
আজির শপনে দেখ্যাছি নয়নে
আমার ভবনে আইল ভবানী।।" (গীত নং ২৯)

মেনকা স্বপ্নে আরও দেখেছেন যে, কন্যার ছিন্নবস্ত্রই অশ্রুপূর্ণ। শ্মশান বিহারী, খেপা, উলঙ্গ জামাতার সংসারে রাজনন্দিনী গৌরীর দিন যে দুঃখে অতিবাহিত হচ্ছে, তা রানী লোক মুখে শুনতে পান —

আমি শুন্যাছি লোকের মুখে গৌরীর দিন জায় দুখে
ভিকারী পতি সঙ্গ হৈয়্যা। (গীত নং ৩২)

অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামীর কাছে মেনকার সকাতর প্রার্থনা গিরিরাজ যেন উমাকে গিয়ে নিয়ে আসেন। প্রার্থনায় গিরিরাজ যথোচিত সাড়া না দিলে অভিমানাহত রানী স্বামীকে 'পাষান - হৃদয়' বলে অভিযুক্ত করে বলেন —

নারদে কি কব কিবা মতি তব পিতা হৈয়্যা হত্যা করিলে নন্দিনী।
(গীত নং ২১)

অবশেষে উমার আগমনে সব বিচ্ছেদ - বেদনার উপশম ঘটে। 'আগমনীর' একটি পদে (৩২ নং) জননীর জন্য উমার উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে।

আগমনীর বৈশিষ্ট্য মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের পদগুলির অভিনবত্ব অবিসংবাদ উল্লেখ্য। কোচ রাজবংশে উদ্ভবকাল থেকে শিবশক্তি চেতনার ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণও 'শক্তি - পূজায়' অনুরাগী ছিলেন। কোচবিহারের শ্রীশ্রী জয়তারা মূর্তি এবং শ্রীশ্রী আনন্দময়ী কালী তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী আনন্দময়ীর অর্চনার বর্ণনা দিয়েছেন মহারাজের সভাকবি দ্বিজকুঞ্জ সুন্দর। তাছাড়া মহারাজও স্বয়ং গেয়েছেন — (গীত নং ৬৭)

অপরূপ এ বিহারে তারা বিহরে।
কালীর ধাম তানুক কিন্তু মহাকাল - অধিকারে।
বাম খড়্গ কর্ত্তধরে দ্বিতিয় উভয় করে
যেমন উৎপল নরকপাল খর্প্পর ধরে।
এহি ব্রহ্মরূপী তারা ত্রিভুবনে সারাৎ সারা
শ্রীহরেন্দ্র ভণে তারা ভুলি না জেন যমডরে ।।

জগজ্জননী শ্যামার রূপ বর্ণনায় কবিকল্পনা এবং ভাবুকতার সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে —

" যেমত অঞ্জন জিমুত সবিদ্যুত গগনে
তেমনী রমনী রূপা কে রণাঙ্গনে
বিবসনা কে লোল রসনা সমরে একায়
কালান্তক কালরূপা কামান্তক – উর যায় ।
তড়িত জড়িত হাসি তড়িত গামিনী
নখর নিকরে জিনে নিশাকর শ্রেণী
নূপুর কিঙ্কিনী মিশ কঙ্কনে বিরাজে
বামে শশী ভালে শশী কি শোভা হইয়াছে তায় ।
(গীত নং ৬)

কখনো মায়ের রুদ্ররূপে বিহ্বল কবির কাতর প্রার্থনা —

নাচিছ হরহৃদে একি তোমার বিবেচনা ।
শব মা কি বশন ত্যেজ প্রাণবল্লভে ফেলিছনা ।
প্রাণান্ত শঙ্কর প্রপন্নে মা কৃপা কর
প্রলয় হৈতেছে মহী মহীধর থরথর ।

আবার , রামপ্রসাদ – কমলাকান্ত প্রভৃতি শক্তি কবিদের মতো হরেন্দ্র নারায়ণও শ্যামা ও শ্যামকে অভেদ কল্পনা করেছেন । ৪৪ নং গীতটিতে লিখেছেন —

কালী কি সামান্য মেয়্যা ।
কালী ভুলাইলে মহেশ মোহিনী হৈয়্যা ।
দ্বাপরের শেষে নটবর বেশে বৃন্দাবনে আস্যা গোপাল হৈয়্যা
কালী কৈলা গোচারণ গোপীজনমন মোহিলে মোহন বাঁশী বাজাইয়া ।
খর্পর – পূরীত অতিমনোন্নিত বিধুমুখে পূধাপান তেজিয়া
কালী রূপ ধারিণী হৈয়া নিলমণী হৈইল খির ননী লোভে ভুলাইয়া ।

বলিছে হরেন্দ্র   মজ্যা ব্রহ্মানন্দে   অভেদে এভাবে মগন হৈয়া
থাক দিবা বিভাবরি মনরে
কামাদি ছয় অরি পাবে পরাভব   জাবে পলাইয়া ।

৪৬ নং পদটিতেও অনুরূপ ভাবের প্রকাশ ঘটেছে ।

কয়েকটি পদে (যেমন গীত নং ৫৭ , ৫৮ , ৫৯) মুক্তিপ্রদা , ভবভয়-হারিণী জগজ্জননীর কাছে ভক্তকবি [illegible] ভববন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করেছেন । কবি নিজেই নিজেকে [illegible] আশ্বস্ত করেন —

কালীপদ কর সার   জান না মন আমার
ও পদ কাণ্ডারী ধরী   রাখরে যতনে ধরি
অবশ্য হইবে পার কদাচ ভাবো না ।   (গীত নং ৭০)

রূপকপ্রতীকের সাহায্যে তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দানের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় —

চল তনুতরী বেয়্যা   কালী বৈল্যা ভবার্ণবে ।
হৈয়া পার অনায়াসে   সুখে কালীপুরে জাবে ।
ভক্তির বাদাম বায়   মন আটা বন্ধতায়
পড়িলে তুফানে তরী পালে নৌকা টান্যা লবে ।
(গীত নং ৭১)

হরেন্দ্র নারায়ণ মূলত ভক্ত — শক্তি সাধক নন । শক্তি তন্ত্রের সাধকের পদে ইড়া , পিঙ্গলা , সুষুম্না , মূলাধার প্রভৃতি শব্দ বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে ব্যবহৃত হয় । হরেন্দ্র নারায়ণের শক্তি সঙ্গীতে এসব শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না ।

গীতাবলীতে সরস্বতী , লক্ষ্মী , শিব প্রভৃতির বন্দনাও আছে । এসব ক্ষেত্রে ভক্তির চেয়ে আলংকারিক বাক্‌রীতি এবং ছন্দকলাই মুখ্য হয়ে উঠেছে । 'ভাব' ও কিছুটা আড়ষ্ট । "সরস্বতী বন্দনায়" (গীত নং ৬৩) কবি যেন

কাব্যের নায়িকার রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন —

নিতম্ব সুন্দর বেশ   মোড়ে পিঠ পৃষ্ঠ দেশ
হেরি হরী লাজে কৈল প্রবেশ কাননে।

'লক্ষ্মীবন্দনা'য় (গীত নং ১০২) কবি লক্ষ্মীকে ধনদাত্রী রূপে দেখেননি —

প্রধান বিদ্যা যিনি   আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী
ভোগ মোক্ষদা সারদা ব্রহ্ম সনাতনী।

মূল শক্তির অভেদত্ব কল্পনা কবিমানসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অবশেষে বলা যায় যে ১৯শ শতকের কবি হরেন্দ্র নারায়ণ অষ্টাদশ শতকের কোন কোন শাক্ত পদকর্তার পদরচনারীতি এবং 'ভাব' অনুসরণ করে থাকলেও অনুকরণ করেন নি। তাঁর শব্দচয়ন কুশলতা, সুর বৈচিত্র্য, ছন্দমধুরতা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে হরেন্দ্র নারায়ণ নিষ্ঠা, সততা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম, শল্য, সভা ও শান্তিপর্ব অনুবাদে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'সভা' পর্বটি তিনি দ্বিজ ব্রজসুন্দর ও দ্বিজ জয়দেবের সঙ্গে মিলিত ভাবে আরম্ভ করেছিলেন। এই কবি দুজনের কাব্য প্রতিভা প্রশংসনীয়। তবুও মহারাজ কেন তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তা বলেন নি। 'শল্য' পর্বের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও তিনি করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে শল্য নিহত হওয়ার পরই তিনি সমাপ্তিরেখা টেনে দিয়েছেন।
মহাভারত অনুবাদে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারতকেই অনুসরণ করেছেন। আর আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে সারানুবাদেই বেশী জোর দিয়েছেন। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।
অনুবাদ শাখায় হরেন্দ্র নারায়ণের বিশিষ্ট অবদান রামায়ণ 'সুন্দরকাণ্ড' অনুবাদ।

একক প্রয়াসে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই " কাণ্ডটি " অনুবাদ করেছিলেন। হরেন্দ্র নারায়ণের সময়েই কোচবিহার রাজসভায় সর্বাধিক সংখ্যক পুরাণ অনূদিত হয়। মহারাজ স্বয়ং বৃহদ্ধর্ম পুরাণের 'মধ্য' ও 'উত্তর' খণ্ড অনুবাদ করেন। স্কন্দ পুরাণ - ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের অনুবাদ শুরু করেন শেষ বয়সে। শেষ করার আগেই তিনি বারাণসী যাত্রা করেন।

রামায়ণ - মহাভারত অনুবাদে আলংকারিক কল্পনা থাকলেও পুরাণ অনুবাদের ভাষা একান্তই সহজ - সরল। উদাহরণ স্বরূপ বৃহদ্ধর্ম পুরাণের (পুথি নং ২২) অংশ বিশেষ নীচে দেয়া হলো —

" এ সবাক পুত্র বলি জানিবা তাপস।
পিতায় পরম স্বর্গ কহে মহাযশ।।
পিতা ধর্ম পরম তপস্যা রূপ তিনি।
পিতৃ তুষ্টে সর্বদেব তুষ্ট কহে মুনি।। (পৃঃ ৬।ক)

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ 'যশোলাভ লোভে' অথবা 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হননি। কিন্তু কবি প্রতিভার সীমা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। স্কন্দ পুরাণ - ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের ভণিতায় পুরাণাদি অনুবাদে ব্রতী হওয়ার কারণ বিনীত ভাবে ব্যক্ত করেছেন —[২৪]

স্কন্দ পুরাণক ভাষাবন্দ পুবচন।
করিব সকল লোকে বুঝন কারণ।।
বিঘ্নকর নিঘ্ন হর দীপপুর স্বামি।
অতিমূঢ় মতি মন জ্ঞানহীন আমি।।
তোমার চরিত্র চিত্র পবিত্র মহত।
রচিয়াছে বেদ ব্যাস স্কন্দ পুরাণত।।
প্রাকৃত মানবে তারে না পারে বুঝিতে।
এমতে বাসনা করি ভাষা বিরচিতে।।

হরেন্দ্র নারায়ণের সাহিত্য সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও মূল্যায়ণের জন্য বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে একটি রূপরেখা মাত্র অঙ্কন করা হলো।

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণও প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। এ সঙ্গীতগুলি 'মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ' শীর্ষক পুস্তিকায় সাহিত্য সভা থেকে ১৩৪৫ সনে খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদিত হয় শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দ্বারা।

সংগৃহীত ৪৭ টি সঙ্গীতের সবগুলোই মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রচনা নয়। যেমন ৪ নং সঙ্গীতটির ভণিতায় আছে — "কহিছে হরেন্দ্র ভূপ...."। বেশ কিছু সংখ্যক সঙ্গীতের ভণিতায় রচয়িতার নাম নেই। সমস্যা হচ্ছে ভণিতা-হীন সঙ্গীতগুলো মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের দ্বারাও রচিত হতে পারে। কারণ সম্পাদক শ্রীঘোষাল ভূমিকায় লিখেছেন যে, কোচবিহার স্টেট্ আর্কাইভসের সহায়েরে খানায় রক্ষিত যে খাতায় মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গীতগুলো নকল করা হয়েছে, সেই খাতাটিরই শেষের দিকে — "মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে।" অতএব যে সব সঙ্গীতের ভণিতায় — 'হরেন্দ্রনন্দন', 'হরেন্দ্র সুত' 'শিবেন্দ্র', 'শ্রীশিবেন্দ্র', 'ভূপশিবেন্দ্র' বা 'শিবেন্দ্র ভূপ' আছে সেগুলোর ভিত্তিতে মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের কবিপ্রতিভা এবং মানস বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। উল্লিখিত ৪৭ টি গীতের মধ্যে একটি ছাড়া (৩৮ নং) আর সবগুলোকেই শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তবে নিশ্চিতরূপে মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রচিত গীতের সংখ্যা হচ্ছে ৪০ টি। এগুলোর মধ্যে আগমনী বিষয়ক (৭ টি), জগজ্জননীর রূপ বর্ণনামূলক (৬ টি), কোচবিহারের অধিদেবতা শ্রীশ্রী মদন-মোহনের রূপবর্ণনা মূলক (১ টি) গীত আছে। বাকীগুলোতে শ্যামাপদে আত্মনিবেদিত ভক্তের ঐকান্তিক আকুতি ব্যক্ত হয়েছে।

আগমনী বিষয়ক সঙ্গীতগুলোতে তনয়া [illegible] বিচ্ছেদ জনিত দুঃখার্তি, প্রবাসীতনয়ার জন্য উৎকণ্ঠা শেষে মিলনের আনন্দ হৃদয় বীণার বিচিত্র তারে ঝঙ্কৃত হয়েছে।

উমা বিরহিনী মেনকার " সদত (সতত) বিদরে বুক" (গীত নং ১৪), এবং মন আর প্রবোধ মানে না। শিবেন্দ্র নারায়ণের 'মেনকার' কিন্তু জামাতা শিবের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তিনি শুধু মেয়েকে কিছু দিনের জন্য কাছে পেতে চান। গিরিরাজ উমাকে নিয়ে এলেন। উমাদর্শনে স্নেহ-ব্যাকুলা মেনকা দু-বাহু বাড়িয়ে বলছেন ——

" আইস আইস উমা করিলো কোলে :

একবার বিধুমুখে উমা ডাক মা বলো।" (নং ১৭)

উমার 'মা' সম্বোধনে সব জ্বালা প্রশমিত হলো ——

" উমাধন মা বলিয়া মোরে ডাকিছে।" (নং ১৬)

তত্ত্ব নয়, ভক্তি নয় একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সহজ ভাষায় বাৎসল্যের এক অপরূপ চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল ভূমিকায় (পৃঃ ৶) লিখেছেন —" মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ও শিবেন্দ্র নারায়ণের ইষ্টদেবী কালী।" আবার জয়নাথ মুন্সী মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণকে 'শক্তি - শিরোমণি' বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। অতএব জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় সাধক সত্তা ও কবি সত্তার সঙ্গে ঐকান্তিক ভক্তি মিশ্রিত হয়েছে। আনন্দময়ী শ্যামা —" নবীন নীরদনীল নীরদ বরণী"। তিনি 'হরহৃদিপরে' বিরাজমানা, " তারা ভয়ানক ভয় হরা"[২৫] দনুজবধির সিক্ত সমরাঙ্গনে দেবীকে দেখে মনে হয় ——

" যেন শোণিত সরোবরে নীল নলিনী বিহরে"।[২৬]

হরহৃদিপরে বিরাজিতা শ্যামা ——

" যেন শ্বেতাম্বুজ পর শোভে নীল নলিনী"।

কৃষ্ণবর্ণা আয়ুধশোভিতা আসবমত্তা হরহৃদিপরে দণ্ডায়মানা দেবীর রূপ বর্ণনায় ভক্তি ও মাধুর্যের প্রলেপ যেমন দিয়েছেন তেমনি সাধকের দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস নিয়েছেন । ৪৪ নং গীতটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য —

হৃদিসরোরুহ মাঝে শ্যামা শোভা কৈর্যাছে ।
জন্ম সফল কর্ম পূর্ণ হৈয়াছে ।।
সার্দ্ধ ত্রিবল্যাকৃতি রূপে মূলাধারে স্থিতি ।
পদ্মবনে জাগ্যা শিব সঙ্গে মিল্যাছে ।
যত মানস তিমির ছিল   কালীপদে মিশাইল ।
শিবেন্দ্র কহিছে আমার সে ভয় গিয়াছে ।

এখানে কুণ্ডলিনীযোগের ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে ।

শিবেন্দ্র নারায়ণের আরাধ্যাদেবীর পদে আত্মনিবেদন এবং ঐকান্তিক প্রার্থনা সমন্বিত পদগুলো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে । অপুত্রক মহারাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও রিক্ততা অনুভব করেছিলেন । শেষ জীবনে নাবালক দত্তক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে বারাণসী যাত্রা করেন । আত্মনিবেদনের পদগুলি তাই বেদনাসিক্ত ।
'মা' ছাড়া অবোধ সন্তানের যেমন কেউ নেই, তেমনি জগজ্জননী ছাড়া কবিরও কেউ নেই ।

কায়বাক্য চিত্তমন,   ধনদারা পরিজন
করিলাম সমর্পণ   জান মা কর মা নিজগুণে ।।
ভবের ভাবনা যত   মিছা ভাবি অবিরত
কান্দ্যা শ্রীশিবেন্দ্র কয় আমার কে আছে মা তোমা বিনে ।
(গীত নং ৬)

কখনো আক্ষেপের সুর —

কত সব মা জগদম্বা   প্রকৃতি বালকে দয়া হৈল না ।
(গীত নং ১)

" যে ভাবে দিন যাইছে আমার তাকি তুমি জাননা মা । "

(গীত নং ২৪)

শেষে ঐকান্তিক আকুতি —

শ্রী শিবেন্দ্র ভূপেতনে নিবেদি মা শ্রীচরণে
অন্তকালে পদতলে রাখিও আমায় ।।

(গীত নং ৩০)

' শক্তি শিরোমণি ' শিবেন্দ্র নারায়ণ রাজ্যের অধিদেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহনের পদেও অকৃত্রিম ভক্তিপুষ্প অর্পণ করেছেন —

বিরাজে মদনমোহন রসরাজ
রস উল্লাসে রাসবিহারী ।
কিবা ও ধূপ দর্পন যত ভক্তজনগণ
হৈয়া আনন্দ মগন
আতুল প্রদান করে তুলসীর মঞ্জরী ।
শ্রী শিবেন্দ্র ভূপে কয় হরি তুমি দয়াময়
পদে দিও হে আশ্রয়
অন্তকালে হৃদকমলে দিও দেখা শ্রীহরি ।।

(গীত নং ৩৬)

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা খুববেশী নয় । পদের শীর্ষে রাগ - রাগিনীর উল্লেখও নেই । রঘুনাথ মুন্সী যতই বলুন না কেন, মহারাজ সাধক নন — পিতার মতই ভক্ত এবং কবি । পিতা ও পুত্রের মিলিত প্রয়াসে এখানে ' শক্তি - গীতির ' একটা ধারার উদ্ভব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল । কিন্তু উত্তর সূরীর অভাবে তা বিলুপ্ত হয় ।

দ্বিতীয় পর্বে রচিত সাহিত্য - সম্ভারের পরিচয় দেবার আগে সামান্য ভূমিকার বা প্রাক্ কথনের প্রয়োজন আছে ।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্য রচনার ধারা মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণে এসে সহসা শেষ হয় । এর পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না । ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিবেন্দ্র নারায়ণের মহিষী রাণী বৃন্দেশ্বরী " বেহার বৃত্তান্ত কিছু " প্রচারের উদ্দেশ্যে ' বেহারোদন্ত ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ।
' বেহারোদন্ত 'র ভণিতায় এর রচনা কালের উল্লেখ রয়েছে ।

" অষ্টাদশ শতে কাণী শকের নির্ণয় ।
মৃগেন্দ্রর পঞ্চ দিনে লিপি সাঙ্গ হয় ।।
সুশাস্ত্রে বেহারোদন্তাখ্যিত করি ।
পুণ্যিশ সমাজেতে দিতে এর ভরি ।। " [২৭]

গ্রন্থকর্ত্রীর মতে এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতে কাণী শকে অর্থাৎ ১২৭১ সন্ , বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় । তখন নাবালক রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনে আসীন । রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে রাজান্তঃপুর থেকে । রাজান্তঃপুরিকাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতা এবং সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন রাণী বৃন্দেশ্বরী । তিনিই পূর্বপুরুষদের ইতিহাস কাব্যাকারে প্রকাশের জন্য এ কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । এটি পুরোনো ধারায় এবং ধাঁচে রচিত হলেও আধুনিক সাহিত্যের দু-একটি লক্ষণ এতে রয়েছে । অতএব পুরাতনের অবসান এবং নতুনের আবির্ভাবের মাঝখানে এর স্থান — অনেকটা সংযোগ রক্ষাকারী প্রজাতির মতো ।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ' বেহারোদন্ত ' নানা ত্রুটি সমন্বিত । তবে বৃন্দেশ্বরী রিপুঞ্জয় বা দুর্গাদাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলে মনে হয় না । কারণ এঁদের [২৮] রচনা বৃন্দেশ্বরীর রচনার সমসাময়িক । সেক্ষেত্রে " রাজোপাখ্যান " এবং রাজান্তঃপুরের বুড়ী-নানা সম্ভবতঃ তাঁর তথ্যের উৎস ছিল । ' বেহারোদন্ত ' ভ্রান্তি আছে — থাকাই স্বাভাবিক ।

বৃন্দপুরী রাজবংশের ইতিহাস কীর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য রচনা শুরু করলেও অচিরেই পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের নানা কথায় জড়িয়ে পড়েছেন। ইতিহাস গৌণ হয়ে রচয়িত্রীর ব্যথা - বেদনা - কল্পনার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আগেই বলেছি বৃন্দপুরী শিক্ষিতা (সেকালের বিচারে) ছিলেন। 'বেহারোদন্ত' সম্পাদিকা নিরুপমা দেবী লিখেছেন —[২১]

" তাঁহার পুত্রবধূর নিকট শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে বিবাহের পর তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট লেখা - পড়া শিখিয়াছিলেন। " তাছাড়া শিবেন্দ্র নারায়ণ পর্যন্ত সভাকাব্যের স্রোত প্রবাহিত ছিল। মহারাজ স্বয়ং কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। স্বামী সান্নিধ্যের ফলে তাঁর সুপ্ত কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটা অসম্ভব নয়। 'বেহারোদন্ত' বৃন্দপুরী শিবেন্দ্র নারায়ণ রচিত একটি পদও মুদ্রণ করেছেন। কাব্যারম্ভে প্রথানুসারে গণেশ, মহামায়া, কালী প্রভৃতির বন্দনা রয়েছে। এই বন্দনা পদগুলিতে " গীতি কবিতা "র প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় —

পিতামহ নরপতি   যাঁহার আজ্ঞায় স্থিতি
স্থাবর জঙ্গম আদি করি।
দুর্গা দুঃখ বিনাশিনী   জগৎ জননী যিনি
স্থাপি থাকে হৃদয় উপরি॥

(বেহারোদন্ত - পৃ : ১)

'বন্দনা'র পর আত্ম পরিচয় দান। সংক্ষেপে বিবাহ এবং মহারাজের রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা ইত্যাদি দেয়া হয়েছে।

বিয়ের অল্পকাল পরেই বৃন্দপুরীর জীবনে দুঃখের মেঘ ঘনিয়ে আসে। সাত বৎসর রাজত্বের পর অপুত্রক মহারাজ 'কাশীবাসী' হন। এ সময় বৃন্দপুরী অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী। বিকচোন্মুখ পুষ্পের মতো স্বামী সোহাগের আলোক প্রত্যাশী। অথচ অসুস্থ স্বামী যাত্রা করলেন তীর্থে। মহারাজ তাঁকে সন্তানও দিতে পারেন নি। আসন্ন বৈধব্যের কৃষ্ণমেঘ ঈশানকোণে অপেক্ষমাণ। বাইরে ঐশ্বর্যের সমারোহ অন্তরে মরু - রিক্ততা। তাই

স্বামী বিয়োগের পর বৃন্দেশ্বরী অভিমানাহত কণ্ঠে বলেছেন —[৩০]

" তনয় বান্ধব জনে ছাড়ি এ দুঃখিনীগণে
তুমি নাথ করিলে গমন ।
সব আশা দূরে গেল দশদিক শূন্য হল
কি করিলে ধার্ম্মিক রাজন ।।"

বৃন্দেশ্বরী জীবনাকাশ উত্তর কালেও নির্মুক্ত হয়নি । নাবালক রাজা নরেন্দ্র - নারায়ণের অভিভাবিকা রূপে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকার সময়ে নানা ঘাত - প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বলেছেন —

যেরূপ লাঞ্ছনা লোকের গঞ্জনা জানাইতে নারি বাপ ।
সেই দুঃখে মন জ্বলে করে জ্বালাতন মনে হলে বাড়ে তাপ ।।
* * *
কোন বিষয়েতে বাঞ্ছা নাই চিতে তুষ্টে রুষ্টে নাহি ভয় ।
সুখ দুঃখ মম হইয়াছে সম চিন্তামাত্র বিশ্বময় ।।
এ ধন সম্পদ কেবল আপদ অন্তিমেতে কেবা যাবে ।
তুচ্ছ এ সংসার কেবল অসার চরণে কে কোথা রবে ।।
শাস্ত্রেতে বর্জিত ধর্ম্মে নাই চিত বর্ণিবারে সাধ্য নাই ।
কেবল ভাবনা গঙ্গা যমুনা ঐ পদ সদা চাই ।।
মনের বিকার ঘুচত নাই আর বৃথা দিন চলি যায় ।
শ্রী বৃন্দেশ্বরীর যেন এ শরীর লিপ্ত হয় রাঙা পায় ।।

(বেহারোদন্ত পৃ : ৭৩ - ৭৪)

বৃন্দেশ্বরী যৌবনেই যোগিনী । এই আখ্যান কাব্যে নানা কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে একটি অবীরা নারীর দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করে তোলে পাঠকের হৃদয়াকাশকে ।

এই আখ্যান কাব্যটির আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেকালের (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর) কোচবিহারের নানা রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, বাদ্য-ভাণ্ড, নারীদের অলংকার বেশ ভূষাদির বিবরণ, রাজ্যাভিষেকের বিস্তৃত বর্ণনা এতে রয়েছে। অধুনা অপ্রচলিত অনেক শব্দের ব্যবহারও এতে দেখা যায়। যেমন — উবুধু বাজার (সৈনিকের হাট), খানেমাদ (পোষ্য), ফরী (ঢাল), ছিকা-কলকা (উষ্ণীষ বিশেষ), খাম্ভ (ডান পাশ), করাঙ্কিত (লিখিত বার্তা) ইত্যাদি। অনেক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার লেখিকার আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় সূচিত করে।

মহারাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় কোচরাজ পরিবারের বিবাহ-রীতির বিশিষ্টতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

সেকালের বিচারে বৃন্দেশ্বরী যে শিক্ষিতা ছিলেন তার একটি নির্ভুল প্রমাণ দিচ্ছি।

উচ্চশিক্ষার্থে নরেন্দ্র নারায়ণকে কৃষ্ণনগরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। পুত্রবিচ্ছেদ কাতরা বৃন্দেশ্বরী এবং কামেশ্বরী সমস্ত দেব দেবীর কাছে যে ভাষায় প্রার্থনা করছেন তা রামের বনবাসকালে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা বাণীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

"সুতের মঙ্গল কর   গণ বিঘ্ন লম্বোদর   ব্রহ্মা বিষ্ণু বৃষভ বাহন।
একাদশ রুদ্র ব্যূহ   আদিত্যাদি নবগ্রহ   ইন্দ্র আদি দিক পালগণ।।
দেবতার সেনাপতি   কার্তিকেয় মহামতি   করিবেন রক্ষা সর্বস্থলে।
সবারে করিয়া দয়া   ভগবতী মহামায়া   তরাবেন বিপদ সকলে।।
সিদ্ধ সাধ্য সমীরণ   বসু নক্ষত্রাদিগণ   নাশিবেন বিপক্ষের বল।।
সাঙ্গ দেব বিদ্যা যত   পুরাণ আগম তত   সাধিবেন সতত মঙ্গল।।
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি যত   রাজ ঋষি শত শত   শ্রীনারদ বৈষ্ণব প্রধান।
ধৃতি স্মৃতি মেধা বুদ্ধি   লক্ষ্মী তুষ্টি ইষ্টসিদ্ধি   বাগ্‌বাদিনী করুন কল্যাণ।।
ঊর্ধ্ব আদি দশদিশা   বর্ষমাস দিবা নিশা   সকলে হইবে শুভঙ্কর।
পিশাচ দানব যত   কৌণপ গন্ধর্ব সদা   কেহ না হইবে বিঘ্নকর।।

সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত করী বরাহ ঘোটক অরি গণ্ডার ভল্লুক আদি শিবা ।
যত ঘোর রূপ ধারী জলস্থল ব্যোমচারী কেহ যুতে দুঃখ নাহি দিবা ।।"

(বেহারোদন্ত - পৃ : ৩১ - ৪১)

এর সঙ্গে মূল রামায়ণের অনুরূপ অংশের তুলনা করা যেতে পারে ।
কৌশল্যা কহিলেন —[৩১]

" সাধ্য বিশ্বদেব মরুৎ ইন্দ্রাদি লোকপাল বরুণাদি ছয় ঋতু মাস সংবৎসর দিনরাত্রি মুহূর্ত কলা এবং বিরাট বিধাতা পূষা ভগ অর্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন । ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি সপ্তর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন । প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদয় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। - - - - - - - ক্রূর কর্মপরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্রজন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয় সঞ্চার না হয় । - - - - - হস্তী ব্যাঘ্র বিশাল দশন ভল্লুক খড়গধর করাল দর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্য - মাংসভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব , তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে । - - - - - - -
অন্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণি সমুদয় এবং যে সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন । শুক্র সোম সূর্য কুবের যম অগ্নি বায়ু ধূম এবং ঋষি মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন । সর্বলোক প্রভু ভূত - ভাবন স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন। "

বৃন্দাসুন্দরী অনুবাদ কর্মে ব্রতী হননি । উদ্ধৃতাংশ তাঁর অনুবাদ কুশলতার পরিচয়ও নয় । এ শুধু তাঁর উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সামান্য আভাস মাত্র । মূল সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকলে এ ভাবে লেখা সম্ভব নয় । যত তথ্য সমৃদ্ধই হোক না কেন 'বেহারোদন্ত' ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা , আশা - আকাঙ্খাই মুখ্য । আখ্যানের মাঝে মাঝে বেদনাহত মনটি যেন হলুদবৃন্ত শেফালীর মতো টুপ্ টাপ্ করে ঝরে পড়ে ।

মহারাণী বৃন্দেশ্বরী 'বেহারোদন্ত' রচনা করে কোচরাজ অন্তঃপুরে সাহিত্য সাধনার যে শুভ সূচনা করেছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপে আত্ম প্রকাশ করল দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী পরে। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের মহিষী এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীর সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে কোচবিহারে আধুনিক সাহিত্যের একটা শীর্ণ ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল।

সুনীতিদেবীর জন্ম ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে - মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে — রাজরাণী হয়ে এলেন কোচবিহারে। সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন নব্য - বাংলার শিক্ষা — সাহিত্য-সংস্কৃতি। বংশকৌলীন্য, শিক্ষা, সুরুচি, ঈশ্বরানুরক্তি, মানবতা বোধ - যা উত্তরাধিকার সূত্রে ছিল — তা শ্রীবৃদ্ধি - দীপ্তিলাভ করেছিল পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ এবং স্বদেশ ও বিদেশের অভিজাত ও উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলা - মেশার ফলে।

প্রাক্ বিবাহ জীবনেই সুনীতিদেবীর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল। 'সাহানা' গ্রন্থের ভূমিকায় 'মনোজবা' কাব্য রচয়িত্রী নিস্তারিনী দেবী লিখেছেন — —" আজ বালিকা সুনীতির আট বৎসর বয়স হইতে পনর বৎসর পর্যন্ত ক্ষুদ্র বীণার কোমল ঝঙ্কার বাণীপদে অর্পিত হইল।" 'সাহানা' শুধু মাত্র কবিতা সঙ্কলন নয়। এতে গদ্য রচনাও আছে — আছে অনুবাদও। কবিতাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্যও কম নয়। পারিবারিক জীবন, প্রকৃতি, ঈশ্বর মহিমা, দেশ-প্রেম কিশোরীর কাব্য সাধনার বিষয় বস্তু হয়েছে। 'সাহানা'য় কবি-প্রতিভার প্রস্ফুটনকারক পুষ্প টিতে হলো বিংশ শতকের গোড়া থেকেই। কাব্য ও সঙ্গীতে, ছোটগল্পে ও রূপকথায়, জীবন চরিত এবং আত্ম চরিত রচনায় অর্থাৎ রস সাহিত্যের নানা দিকেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর অধিকার সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

এই বিচিত্র রচনা সম্ভারের বিস্তৃত আলোচনা করতে পারলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে 'সাহানা' অমৃতবিন্দু (প্রথম খণ্ড), কথকতার গান, ঝড়ের দোলা এবং

ইংরেজী রচনার মধ্যে Indian Fairy Tales ও The Antobiography of an Indian Princess —— ছাড়া আর কিছু দেখার সুযোগ হয়নি। রচনাগুলোর দুষ্প্রাপ্যতাই আলোচনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাপ্ত রচনাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেয়া হলো।

'ঝড়ের দোলা' —— চারটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। এই চারটি গল্পের মধ্যে সুনীতিদেবীর 'পাগল' গল্পটি প্রথমেই রয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র বল (মাধুরী), শ্রীমণীন্দ্র লাল বসু (শ্রীপতি) শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাস (জয়মালা)। শেষোক্ত লেখকই এর প্রকাশক। 'পাগল' গল্পের বিষয় বস্তুতে কোনো অভিনবত্ব নেই। প্রতিপ্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় শোকক্ষুব্ধা নারীর উক্তির মাধ্যমে ঘটনার একটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তবে সে উক্তি কোনো 'প্রলাপ' নয়, বিলাপও নয় — শোকের তীব্র অভিব্যক্তি। আর তীব্রতার জন্যই কিছুটা প্রশংস্য।

"ঐ দেখো, ওকে কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? —— কোথায় ওকে নিয়ে যাচ্ছে? ওরা কি আমারই মত ওকে ভালবাসবে? ওকে যতনে ধরে, ওকে আদর করে প্রাণের সকল চিন্তাকে মুঞ্জরিত করে তুলবে? আমার অন্তর বুঝতে পারবে ওরা — সে ডাকছে?" ভোলা ওদৈক চিকিৎসক। নীরবে তিনি এই কাতরা নারীর হাহাকার শুনছেন।

—— "আঃ একবার ছেড়ে দেবে না? একবার। ও আমার জীবন-মরণের সম্বল, আজ তোমায় পাই যদি তবে তোমায় বুকে নিয়ে এই ঝড়ের দোলায় দুলি।"

কাহিনীর নিটোল বিন্যাস, জীবনের খণ্ডাংশের চকিত উদ্ভাস, রসসমৃদ্ধি এতে নেই। বিষয়টিই এমন যে লেখিকা ক্ষুদ্র পরিসরে সে সব সৃষ্টির অবকাশ পাননি। একমাত্র বৈশিষ্ট্য মেদভার বর্জিত বাচনভঙ্গী। তবুও এই গল্পটিই সঙ্কলনে প্রথম-স্থান পেয়েছে এবং সঙ্কলনের নামকরণে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

' কথকতার গান'গুলো বিভিন্ন আখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত ।
শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখেছেন —[৩২] " সমাজ সংস্কার , বালক - বালিকাগণের নীতি শিক্ষা , ধর্ম্মোপদেশ ও কথকতা দ্বারা লোকশিক্ষায় একান্ত উৎসাহশীলা , নিজে অতিসুন্দর কথকতা করিতে পারিতেন । রামমোহন লাইব্রেরীতে বহুবৎসর পূর্ব্বে আমাদের একবার তাঁহার ' ধ্রুব ' সম্বন্ধে কথকতা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল ।"
কথকতার গানগুলো রাজা হরিশ্চন্দ্র , ধ্রুব , ঐন্দ্রিলা , ঊষাবিজয় , বুদ্ধদেব চরিত , সতীজন্ম ও [illegible] পালার কথকতা উপলক্ষে রচিত । এই গানগুলো সুরে সমর্পিত হয়ে যে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করত তা বুঝে নেবার কোনো উপায় নেই । তবে এগুলোর কাব্যমূল্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর ছিল না । উদাহরণ স্বরূপ যশোধরার গানটি নীচে দেয়া হলো —

দাসীরে কি মনে আছে করুণাময় স্বামী ।
তোমা বিনে দেখ দেব যশোধরা কাঙালিনী ।।
লয়ে যাতে ভিক্ষাপাত্র এসেছ আজ হয়ে বুদ্ধ
মম মুক্তি তব পদে ওহে শাক্য চূড়ামণি ।
ভিখারি সন্ন্যাসীর সাজে এসেছ হে পিতার রাজ্যে
যশোধরা তোমারি নাথ ভিখারিনী সন্ন্যাসিনী ।

করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধের কাছে মুক্তি কামী কোনো সাধারণ নারীর আবেদন এটি নয় । স্বামীর কাছে সহধর্মিণীর বেদনাহত চিত্তের আকুতি । প্রচ্ছন্ন অভিমান খুব একটা দুর্লক্ষ্য নয় ।

' Indian Fairy Tales - এ পরিচিত রূপকথার গল্পকে সহজ ভাবে ইংরেজীতে যুক্ত অনুবাদ করা হয়েছে । এটি রচনার উদ্দেশ্য উৎসর্গ পত্রেই ব্যক্ত হয়েছে —

Dedicated with kind permission to

Her Royal High ness

Princess Victoria of Wales.

অনুবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কতকগুলো বাংলা শব্দকে তিনি নিঃসংকোচে ব্যবহার করেছেন যদিও তার অর্থ বন্ধনীর মধ্যে দিতে ভোলেন নি। যেমন বধূপাল্কি (bridal palki) 'বরণ' (The wel-coming ceremony) ইত্যাদি।

সুনীতি দেবীর বিশিষ্ট ইংরেজী রচনা হচ্ছে তাঁর আত্মচরিত —

The 'Autobiography of an Indian Princess'

বইটি সুখপাঠ্য এবং নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। সুনীতিদেবীর সঙ্গে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ একসময় রাজনৈতিক সংকট এবং সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। সেই ঐতিহাসিক বিবাহের তথ্য এতে আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমন্ত্রণে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। মহারাণীর সঙ্গে সুনীতিদেবীর প্রথম xx সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি ভারী চমৎকার। —[০০]

" I cannot describe my feelings when I found myself in the presence of the Queen. To us Indians she was more or less legendary figure endowed with wonderful attributes, an ideal ruler, and an ideal woman, linked to our hearts across "the black water" by xx silken chains of love and loyalty. I looked at Her Magesty anxiously, and my first impression instantly dispelled my nervousness : a short, stout lady dressed in mourning who came forward and

kissed me twice. - - - - - - I experienced a feeling as did every one with whom Her late Majesty came in contact, that she possessed great personal magnetism, and she certainly was the embodiment of dignity. Her conversation was simple and kindly, and every word revealed her queen, woman and mother."

কত সাবলীল এবং সুন্দর ভাবে প্রথম সাক্ষাৎকারের রোমাঞ্চকর অনুভূতিটি লেখিকা ব্যক্ত করেছেন। ভাবের উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতা আছে, ভাবকতা নেই, সুসংযমিতা আছে। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং দেশ - জাতি - ভাষার দুস্তর ব্যবধান অপসৃত হয়েছে নারীত্ব ও মাতৃত্বের স্নিগ্ধমধুর কোমল স্পর্শে। রচনা - নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে।

'অমৃত বিন্দু' (প্রথম খণ্ড) সুনীতিদেবীর পরিণত মানসের রচনা। এই ধর্মপ্রাণা মহিলা-কবি বিশ্ববিধাতার চরণে ভক্তিনম্র চিত্তে অঞ্জলি প্রদান করেছেন গীতরচনার মাধ্যমে। (প্রথম খণ্ডটির) ভূমিকার সঙ্গীতগুলো বাদ দিলে, সূচীপত্রে মোট ১৬৫ টি সঙ্গীত আছে। সূচীপত্রের বাইরের সঙ্গীতের সংখ্যা চার। এছাড়া ছয়টি স্তব এবং দুটি কীর্তন রয়েছে।
'অমৃত বিন্দু'র অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত। ভগবৎ প্রেমই মুখ্য বিষয়। ঈশ্বর কখনো সখা, কখনো ত্রাতা, কখনো বা প্রাণ - নাথ। কাল সমুদ্রে জীবনতরণী তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত — চারদিকে ঘন অন্ধকার। আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে কবি কণ্ঠ —

কোথা নাথ প্রাণ সখা এস মোরে দাও হে দেখা,
সাগরে যে ভাসি একা ঘিরেছে তরী আঁধারে।

(৪ নং গীত)

এই জীবন দেবতা কখনো প্রেমিকের বেশে আসেন —

ছিনু ঘরে আঁধার কোণে
ভবের ভয়ে একা বসে
আপনি এসে মোহন বেশে
হেসে হেসে ডাকলে আমায় মধুর সুরে।

(১ নং গীত)

কোনো কোনো গীতে তত্ত্ব কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে —

" ডুবিব ডুবিব আমি গভীর সমাধি ভরে
নব বিধানের অরূপ চিন্ময়
স্বরূপ সাগরে।"

এবং ——

" নিত্যাবস্থায় যোগ করিব সম্ভোগ
হবে না বিয়োগ তিলেক তরে।

(গীত নং ২১)

জীবন সায়াহ্নে কখনো বা মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা —

" দিবসের আলো চলিয়া গিয়াছে
সন্ধ্যা কালে কাল মেঘ উঠিয়াছে
ডাকি অনিবার কোথা কর্ণধার
কর ভব পার বাড়ী যাব আমি।

(গীত নং ৩৫)

"অমৃত বিন্দু"-র কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ - উৎসবের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর শীর্ষে রাগ-রাগিনী বা তালের উল্লেখ xxxx নেই। এগুলোর মধ্যে ৫৪ সংখ্যক কবিতাটি বিশেষ ভাবে

উন্মুখ্য — স্বামীর মৃত্যুতে গভীর শোক পেয়েছিলেন। রিক্ততা ও নিঃসঙ্গতা তাঁকে যেন ঘিরে ধরেছিল। রাজপুরীর আনন্দোৎসবের মধ্যেও তাঁর চিত্তে হাহাকার। এরই সকরুণ অভিব্যক্তি ঘটেছে উল্লিখিত কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে —

" বিধবা সাজাল আমাতে ঘুচাল
সুন্দর সিন্দুর মম।"

তখনো জীবনের প্রতি আসক্তি শেষ হয়নি —

" ঘুরিয়া বেড়াই কোথা গেলে পাই
আমার সে প্রিয় - দর্শন,
আবার সাজিতে আবার হাসিতে
আকুল সে মম মন।"

শেষে জগজ্জননীর কাছেই ছুটে গিয়েছেন ——

কাঁদিতে পারি না আর
চোখের জল দে মুছাইয়ে
তুমি যে মা দয়াময়ী
আমি তোমার দুর্বল মেয়ে।
ভবের কাজ শেষ হলে
ডেকো আমায় আয় বলে
মা বলে ছুটে যাব চলে
তব অমৃত আলয়ে।"

'অমৃত বিন্দু' সুনীতির ব্যাকুল-ক্রন্দনগীতি। পারিপাট্য নেই, মণ্ডনকলা নৈপুণ্য বা আলংকারিক দীপ্তি নেই — আছে রিক্ত মানসের অকপট স্নিগ্ধ প্রকাশ।

মহারাণী সুনীতিদেবী ছাড়া বিশশতকে কোচরাজ অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সাহিত্য সাধনায় নতুন সুর সংযোজন করেছিলেন 'ধূপ' ও 'গোধূলি' কাব্যগ্রন্থ রচয়িত্রী নিরুপমা দেবী। ভিক্টোর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী এবং মহারাণী সুনীতিদেবীর পুত্রবধূ নিরুপমাদেবী আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'পরিচারিকা' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র তাঁরই সম্পাদনায় ১৯২৩ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' কাব্যের ভূমিকাও তাঁরই রচনা। উত্তর কালে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন হলেও দুটি কাব্যই সম্ভবতঃ রাজবধূ থাকাকালীন রচিত। প্রথম কাব্যটি (ধূপ) প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে। আর দ্বিতীয়টির (গোধূলি) প্রকাশ কাল ১৩৩২। ১৩৩৩ সালে 'বেহারোদন্ত' সম্পাদনার সময়েও তিনি যে কোচবিহারের রাজকুল বধূ ছিলেন, তা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় —

"পূর্ববর্তী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী আই দেবতী স্বয়ং রাজমহিষী ছিলেন, তিনি আমার পূজনীয় শ্বশুরঠাকুর পরলোকগত মহারাজ স্যর নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর কে. সি. আই এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার স্বামী মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ মহাশয়ের প্রপিতামহী ছিলেন।" (বেহারোদন্ত ভূমিকা পৃঃ ৫)। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল কিনা, তা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে * শুধু মাত্র 'ধূপ' কাব্যটি আছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে নিরুপমাদেবীর স্বকীয়তা এবং বিশিষ্টতা থাকলেও তাঁর কাব্য বহুলাংশে অনালোচিত এবং কিছুটা উপেক্ষিত। এই উপেক্ষার কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

'ধূপ'-এর কবিতাগুলোকে কবি নিজেই কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন।

যেমন — প্রকৃতি, দুঃখ, গান, ভক্তিমূলক ও বিবিধ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবির বিশিষ্টতার কিছু না কিছু স্বাক্ষর রয়েছে। সিন্ধু বিষয়ক কবিতা তিনটির কথাই বলা যাক। বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'সমুদ্র-বিষয়ক' সার্থক কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। নিরুপমা কিন্তু অনেকটাই সফল হয়েছেন। প্রথম কবিতায় ('সিন্ধু') কবির কাছে সমুদ্র চিরচঞ্চল, বন্ধনহারা, চিরনূতন, মহাশক্তিধর অথচ উদার প্রেমিক। কবির বাসনা —

"কাছে টেনে নিয়ে আমারেও তোর করে নে নাচের সঙ্গী।"

বিশ্ববিধাতার শক্তির অন্যতম রূপ এই সমুদ্র —

"জগৎ নাশের জগতে কি তুই প্রলয়ের মহাশক্তি?
তোরে হেরি তাই ঢেউয়ের মতন জেগে পড়ে প্রাণে ভক্তি।"

শেষে শান্তি প্রার্থনা করেছেন সাগরের কাছে —

"বেদনা দুঃখ অন্তর যেন শান্তি সুধায় ভুলে।"

প্রায় অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে 'সমুদ্র' কবিতাটিতে —

"হৃদয় স্পন্দনে তব দাও মৃদু দোল
আনিদিয়া বুকে ধীরে ধীরে,
গুরু গুরু গাহি গান ভুলাইতে দগ্ধ প্রাণ
প্রবাল মুকুট দাও শিরে,
[illegible] বালির শয়ন যেন জননীর কোল।"

তৃতীয় কবিতায় (সংকেত) কবি সাগরের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যেতে উৎসুক —

"তোমাতে আমাতে যেন একেতে মিলাই।"

কবি কল্পনার ক্রমোত্তরণ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। বিস্ময় থেকে অনুরক্তি — পরিশেষে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ।

' বসন্তাগত' কবিতায় কবির ' ফমযুতা' প্রশংসনীয় । অনল - বর্ষী রুদ্র নিদাঘকে বন্দনা করে কবি লিখেছেন —

" রবির অনল ধারা — পার্বতীর পূহ হারা পূণ্য অনুরাগ ,
পবিত্র নির্মল তেজে উষার তপস্যা এ যে , এ নহে নিদাঘ । "

বর্ষার মেঘকে কবি নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধতে চেয়েছেন —

" এস [illegible] প্রাণেশ , এস হে বঁধে ,
এস ক্লান্ত কাতর চোখে ,
এস কৃষ্ণ , এস হে ধ্বান্ত
এস হে দয়িত কান্ত । "

নিরুপমার কাব্যপ্রেরণার উৎস হচ্ছে ' প্রেম ' — আরও বিশদ ভাবে বললে দাম্পত্যপ্রেম । " শঙ্কিত , কম্পিত , দীর্ঘ , স্নিগ্ধ , ঘন " প্রথম চুম্বন " - এ ' যৌবনের আশঙ্কাময় দোলায়িত জীবন ' উদ্ভূত হয়েছিল । দেহ ও মন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রেম রসে । সমস্ত জগৎ হয়েছিল মধুর । মিলন এবং বিরহ দুয়েরই মধ্য দিয়ে প্রেমের উপলব্ধি নিবিড়তর হয়েছে ।

" তোমার বিরহে আজ আমার মর্ম্মাকে হ'ল
বসন্ত উদয় । "

(ছাড়াছাড়ি - পৃ : ১৪৭)

প্রেমকে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঋতুর রূপকে ব্যক্ত করার অভিনব প্রয়াস দেখা যায় ঋতুসম্ভারের কবিতাগুচ্ছে ।

(ক) চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ ,
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ । (নিদাঘ পৃ: ১৫১)

(খ) সর্ব দেহ ঘন হয় যে সরসা ,
আমি জানি সেই মোর মোহিনী বরষা ।　　(বর্ষা - পৃঃ ১৬০)

(গ) আমার মুখের পরে তব আঁখি পাত ,
আমি জানি সেই মোর শারদ প্রভাত ।　　(শরৎ - পৃঃ ১৬১)

(ঘ) যে দিন তোমার প্রাণে ভরা অনুরাগ ,
হেমন্তের নীলাকাশ প্রাণে মোর জাগে ।　　(হেমন্ত - পৃঃ ১৬২)

(ঙ) ডুবাইয়া দাও মত চুমুনের ধারে ,
পুলকেতে রোমাঞ্চিয়া উঠি বারে বারে ।　　(শীত - পৃঃ ১৬৩)

(চ) ' যে দিন তোমার প্রেম হয় মধুময় ,
পল্লব করিয়া তোলে আমার এমন ' ,
এবং
থেমে যায় আর সব মিছা কলরব ,
তোমাতে আমাতে বধূঁ বসন্ত উৎসব ।　　(বসন্ত - পৃঃ ১৬৪)

নিরুপমার ' প্রেম ' বিষয়ক কবিতাগুলো দাম্পত্য সম্পর্কের মাধুর্য সৌন্দর্য ও রোমান্স রসে পরিপূর্ণ । ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকলেও ইতরতা নেই । রোমান্টিক উল্লাসের চকিত উচ্ছাস থাকলেও উদ্বেল হওয়ার মুহূর্তে সহসা অনুচ্চিত ।

' দুঃখ ' বিষয়ক কবিতাগুলোতে কোন নৈরাশ্য বা হাহাকার নেই । দুঃখকে সত্য বলে জেনে কবি তাকে শান্ত চিত্তে বরণ করে নিয়েছেন । প্রথমে দুঃখের সাথে পরিচয় , পরে দুঃখের স্বরূপ অনুধাবন এবং শেষে দুঃখের সঙ্গে পরিণয় । ভাবের গভীরতা তেমন কিছু না থাকলেও প্রকাশে স্বাতন্ত্র্য আছে । দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় — সব ভয় ও ভাবনার অবসান ।

"আমার লজ্জা গেছে ঘুচে,
আমার বাঁধন হ'ল জয়,
আমার সরম গেছে মুছে,
আমার টুটেল সকল ভয়।
আজ ঝড় তুফানে দুলি।
আমার ঘোমটা গেছে খুলি,
আজি নূতন করে তোমার সাথে
নূতন পরিচয় (পরিচয় - পৃ: ৫৯)

দুঃখের সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে বাঁধা হওয়ার বর্ণনাটি ভারী সুন্দর —

আকাশে যেন উঠিয়াছে ঘনঝড়
ঘন সমারোহভরে,
গর্জিছে ঘন অশনির কড় কড়,
দেহ কম্পিত করে।
আমার যেন আলু থালু বেবাস,
কঙ্কন নাই মুখে,
প্রীতি কম্পিত পক্ষিত নিশ্বাস
দাঁড়াইনু সম্মুখে।

. . . .

বিদ্যুতে হ'ল দৃষ্টি - আলিঙ্গন
বিবাহ চমৎকার,
মনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেল মন
গলে নিয়ে দুখহার।

(পরিণয় - পৃ: ৭৬ - ৭৭)

সঙ্কলনের 'গান'গুলোর বিষয়বস্তুতে কোনো অভিনবত্ব নেই। 'গীত'রূপে চিহ্নিত হলেও এগুলোকে প্রেমের কবিতা রূপে গ্রহণ করা চলে। মিলন, বিরহ, বেদনা, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত গানগুলো কবির রচনা বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

নিরুপমার ভক্তি নম্র চিত্তের স্নিগ্ধ সজল প্রকাশ ভক্তিমালার অন্তর্গত কবিতা সমূহে। 'ধূপ' - এর উৎসর্গ পত্রেই কবি বিনম্র চিত্তে বিশ্ববিধাতার চরণে অঞ্জলী দিতে গিয়ে বলেছেন —

" বুকে তুলে নিনু সেবা,
তব পূজাভার নিয়েছে যে জন
তার মত সুখী কেবা?
কোথায় জীবন, কোথায় মরণ,
কোথায় তুচ্ছ প্রাণ,
চরণের কাছে তুলিয়া ধরেছি
ভক্তির ধূপদান।"

এই ভক্তির পথ ধরেই কবি কামনা - বাসনা - বেদনাসিক্ত পার্থিব প্রেমের জগৎ থেকে অনাবৎ প্রেমের উদার পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

' গুঞ্জন করে বুদ্ধ বক্ষে
মহা ওঙ্কার ধ্বনি।" (ঐ - পৃ: ১৬৯)

হাসি - অশ্রু - দুঃখ - বেদনা প্রভৃতি অনুভূতি বিলীন হয়ে গেছে। ভূমানন্দের পুলকে পুলকিত বক্ষে মহা ওঙ্কার ধ্বনির গুঞ্জন।

"বিবিধ" পর্যায়ের কবিতাগুলোতে বৈচিত্র্য থাকলেও বিশিষ্টতা নেই। কতকগুলো কবিতায় (তাজ, ইন্দ্রপ্রস্থ ইত্যাদি) শুধু তথ্যের সমাবেশ। গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতায় বাৎসল্য স্নেহের কাব্যিক প্রকাশ প্রশংসনীয় উৎকর্ষ লাভ করেনি। তবুও নিরুপমার ছ শুচিশুভ্র মাতৃত্ব অকপটে ব্যক্ত হয়েছে।

'ধূপে'র পর 'গোধূলি' রচিত হয়েছে। 'গোধূলি' সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন —[৩৪]

"গোধূলির" অনেক কবিতা কবির কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু সুর ও ছন্দে কোন বৈচিত্র্য কিংবা অভিনবত্ব নাই। অনেকগুলি কবিতা রবীন্দ্রনাথের সুর, ছন্দ ও ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।"

রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত থাকা নিরুপমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেরকম চেষ্টাও হয়তো তিনি করেননি। তবে অন্ধ অনুকরণের কোনো সচেতন প্রয়াসও তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। নিরুপমার কবিতায় উজ্জ্বল বর্ণবিভব, চটুল কল্পনাবিলাস, তীব্র-তীক্ষ্ণ - ঝিলিক বাক্‌ভঙ্গী অথবা গভীর দার্শনিক উপলব্ধি কিছু নেই। প্রেম, ভক্তি আর নিসর্গপ্রীতি তাঁর কাব্য ভাবনার তিনটি দিক। তবে মূল প্রত্যয়টি হচ্ছে "প্রেম"। বিরহ-বেদনা-দুঃখ-কষ্টচেতনা হেমন্তের প্রভাত কুহেলীর মতো তাঁর কাব্যে ধূপছায়া অথবা গোধূলীর আলো - আঁধারী ভাব সৃষ্টি করেছে। আদ্যন্ত রচনায় একটা বিষন্ন করুণ সুরের ধারা প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলে।

রাজ-শাসনাধীন কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার পটভূমি, প্রয়াস এবং বৈচিত্র্যের একটি আভাস আমরা এ অধ্যায়ে দিয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে চর্চার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে সাহিত্য সম্ভার পাওয়া গেল তা প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি অনুবাদ সাহিত্য-এর ধারা, অপরটি মৌলিক রচনার ধারা। এ দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই আছে।

প্রথম পর্বে দুটি ধারাই ধর্মাশ্রিত। অনুবাদ সাহিত্যেই হোক, আর পুরাণাশ্রয়ী আখ্যান কাব্যাদিতেই হোক, দেবমাহাত্ম্য কখনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-আনন্দের প্রতিফলন ঘটেছে।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রাচুর্য বিস্ময়কর, কিন্তু মৌলিক রচনার মতো বৈচিত্র্য তাতে নেই। অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে প্রধানত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষণায়, আগ্রহে এবং কখনো কখনো আদেশে। মৌলিক সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়েছে কবিদের অন্তর প্রেরণায়। তাই দেখা যায় রাজপৃষ্ঠপোষণার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ধারাটি আকস্মিক ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষীণ স্রোতা হলেও তার প্রবাহ রুদ্ধ হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লেখ পঞ্জী :

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ১ম খণ্ড (৪র্থ সং - ১৯৮২) পৃ: ১১-১২
ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। ধর্মপালের তাম্রশাসন — দ্বিতীয় ফলক
(শ্রী পদ্মনাথ শর্মাকৃত প্রথম পৃষ্ঠার অনুবাদ)
রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা — ১৩২২ সন — ২য় সংখ্যা পৃ: ৮১

৩। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম প্রকাশ) পৃ: ৫২ - ৭৫
ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা

৪। ------ ঐ ------- পৃ: ৬৫

৫। অসমীয়া মহাভারত (২য় খণ্ড) পৃ: ১৫০০-১৫০১
শ্রী হরি নারায়ণ দত্ত বরুয়া সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত।

৬। রাজ সভার কবি ও কাব্য পৃ: ২০৪ - ২০৫
শ্রী দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। 'দরঙ্গ রাজ বংশাবলী' (১ম প্রকাশ) পৃ: ১২৩-১২৪
(কবি বলদেব সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ বিরচিত)
শ্রী নবীন চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত।

৮। ------ ঐ ------ পৃ: ১২৫

৯। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম প্রকাশ) পৃ: ১৩৩
ড: সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা

১০। মহাভারত - আদিপর্ব - পুঁথি নং ৭৭ পৃ: ৫২
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ

১১। মহাভারত - গদাপর্ব পৃ: ১৩।খ
(উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রক্ষিত পুঁথি)

১২। রাজভটিয়া নং - ১ পৃঃ ১

শ্রী শঙ্কর বাক্যামৃত

শ্রীহরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া সাহিত্য রত্ন সম্পাদিত।

১৩। গীত চন্দ্রিকা পৃঃ ২

(কালীরাম দেবশর্মা সংগৃহীত - ১১৯০)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের (৬ষ্ঠ সংস্করণ)২৭৪ পৃষ্ঠার

পাদটীকা থেকে উৎকলিত।

১৪। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম মুদ্রণ) পৃঃ ১২০

১৫। ------ ঐ ------ পৃঃ ১২০

১৬। কোচবিহারের ইতিহাস - ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪০

খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ

১৭। A Descriptive Catalogue of Bengali
MSS of Cooch Behar
by
Dr. S.B.Dasgupta - Introduction - p ii

১৮। 'প্রয়োগ রত্নমালা' (মুদ্রিতগ্রন্থ - উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার) পৃঃ ১

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ

১৯। কোচবিহারের ইতিহাস - (১মখণ্ড) পাদটীকা নং ৪১ পৃঃ ১৬৪

খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ।

২০। Introduction - p. 10
A Descriptive Catalogue of Sanskrit
MSS Preserved in the Sahitya Sabha of
Cooch Behar - by -
Prof. D.K. Kanjilal M.A. Ph.D. B.Litt.

২১। A Des. Cat. of Beng. MSS of Cooch Behar - Introduction p.v
Dr. S.B. Das Gupta.

২২। রাজোপাখ্যান — প্রথম খণ্ড পৃ: ১৬ - ১৯

(মুন্সী জয়নাথ ঘোষ বিরচিত)

শ্রী বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত।

২৩। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলী - ১ম খণ্ড - ভূমিকা পৃ: থ

(গীতাবলী)

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত।

২৪। স্কন্দ পুরাণ - ব্রহ্মোত্তর খণ্ড - (পুঁথি নং ১০) পৃ: ১।৫

২৫। মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ

(কোচবিহার সাহিত্য সভা গ্রন্থাবলী — ৭) গীত নং - ৩

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত।

২৬। ------ ঐ ------ গীত নং - ১

২৭। বেহারোদন্ত - পৃ: ৭৪

(মহারাণী বৃন্দেশ্বরী বিরচিত)

শ্রী নিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

২৮। ------ ঐ ------ ভূমিকা - পৃ: ৵

২৯। ------ ঐ ------ ভূমিকা - পৃ: ॥/

৩০। ------ ঐ ------ পৃ: ২১

৩১। বাল্মীকি রামায়ণ - অযোধ্যাকাণ্ড - ২০শে সর্গ পৃ: ১৬১-১৬৩

(হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত)

দ্বিতীয় মুদ্রণ - ১৯৭৮ (ভারবি সংস্করণ)

৩২। বঙ্গের মহিলা কবি - দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৭৮ পৃ: ৩৬৫

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

৩৩। The Autobiography of An Indian Princess p. 108

by

Maharani Sunity Devi.

৩৪। বঙ্গের মহিলা কবি (২য় সংস্করণ) পৃ: ৪০৪

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।